স্বগতোক্তি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

আমি, তুমি, আমরা সকলেই অনেক কিছু বলতে চাই, বলিও, কিন্তু বোধহয় শোনবার লোক পাই না।

পাই না, কারণ যে শুনবে তারও যে বলার অনেক কিছু আছে। তার নিজের কথা কেউ মনোযোগ দিয়ে শোনে না যখন, সে কেন আমার-তোমার কথা শুনতে যাবে?

তাই বোধহয় আমি, আমরা সকলেই, প্রায়ই নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলি. দুপুরবেলার খোঁটায় বাঁধা একলা বাছুরের মতো আমরা সবাই বলি। ভাগ্যিস সোচ্চারে বলি না। আয়নার সামনে বসে চুল বাঁধতে বাঁধতে, অথবা ক্লাসের অফ পিরিয়ডে, অথবা চান করতে করতে আমরা সকলেই নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলি।

আমরা সকলেই লেখিকা নই। আমি তো চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারি না. অথচ আমি কী দারুণ ভাবতে পারি। সময় নেই, অসময় নেই, আমি কেমন ভাবতে বসে যাই। নিজের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা-কাটাকাটি করি।

আজকে আমার ছুটি। আজকে মঙ্গলবার ; অথচ আমার ছুটি। জামশেদপুরে অন্য সবকিছু মঙ্গলবার বন্ধ বলে, আমার স্কুলও ছুটি।

আজ অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম। এখানে যা গরম, প্রথমরাতে ঘুম মোটে আসেই না ; ঘুম আসে শেষ রাতে। ভোরের দিকে খুব আমেজ লাগে, উঠতে ইচ্ছে করে না।

ঘরের মধ্যেই শুই। আমি বাবা পারি না বাইরে শুতে। আমি কলকাতার মেয়ে, বাইরে খোলা আকাশের নিচে শুয়ে আমার অভ্যেস নেই, তারপর পাশেই রাস্তা; কখন শাড়ি উঠে যায়, সায়া উড়ে যায় হঠাৎ হাওয়ায়—আমি পারি না, লজ্জা করে ; তাই আমায় ঘরেই শুতে হয়।

রমেন বাইবেই শোয়। কোনো কোনোদিন শেষরাতে আমার ঘুম ভাঙাতে ঘরে আসে। ঘুমের মধ্যে তখন মনে হয় সবকিছু স্বপ্ন ; অথবা দুঃস্বপ্ন। আমরা মেয়ে, অনেক কিছু ভালো না লাগলেও আমাদের করতে হয় ; ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বেও।

এই গরমে কারুর গায়ের ছোঁয়াই ভালো লাগে না। রমেন অথবা রমেনরা রাতের কোনো এক প্রহরে কালা হয়ে যায়, কানা হয়ে যায়, তখন, কিছুক্ষণের জন্য তারা গুহামানব হয়ে যায়। সেই সব মুহূর্তে ভাবতে ঘেন্না করে যে ওকে আমি স্বেচ্ছায়, ভালোবেসে, বাড়িসুদ্ধ সকলের অমতে বিয়ে করেছিলাম। ভাবতেও ঘেন্না হয়।

ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে ঘরবাড়ি পরিষ্কার করলাম ভালো করে। আজ মুখী আসেনি। মুখী সাঁওতাল মেয়ে। ওই বাড়ির সব কাজকর্ম করে। আজ ও আসেনি। ওর মেয়েটার হাম উঠেছে খুব।

যা তরি-তরকারি কেনা ছিল সব শেষ। একবার বাজারে যেতে হবে।

বাইরে বেরোতে হবে ভাবলেই ভয় হয়—যদিও কদমা বাজার বেশিদূর নয়। রমেন আজ দুপুরে খেতে আসবে—একটু কিছু স্পেশ্যাল রাঁধতে হয় ওর জন্যে।

বাজারে বেরোতে হবে এমন সময় মিস্টার বোস এলেন। সুশান্ত বোস। পাশের বাংলোয় থাকেন। রমেনের প্রথম স্ত্রীর কীরকম দূর-সম্পর্কের কাজিন। ভদ্রলোক মানুষ বড় ভালো। আমার খুব ভালো

লাগে। আজকালকার ছেলেদের মধ্যে স্মার্টনেসের বিকল্প চিবিয়ে চিবিয়ে আমেরিকান উচ্চারণের ভুল ইংরিজি ও অদ্ভুত সাজপোশাক দেখে দেখে এমন ক্লান্তি এসেছে যে তার মধ্যে সুশান্ত বোস একজন ব্যতিক্রম। স্মার্টনেস মানে যে লাফানো-ঝাঁপানো নয়, ড্রেইনপাইপ বা অ্যালিফ্যান্ট্ ট্রাউজার নয়, তার মানে যে ঘন ঘন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়া নয়, সে সুশান্তকে দেখলে বোঝা যায়। ভারী একটা শান্ত সমাহিত চেহারা। কথা বলেন কম, যা বলেন তা বক্তব্যে ভরা। কেন জানি না, ওঁকে আমার খুব ভালো লাগে। এবং ওঁকে ভালো লাগে বলেই ওঁর কাজিন, আমার সতীন (?) অদেখা মমতার প্রতিও আমার বেশ একটা দুর্বলতা জন্মায়; জন্মে গেছে।

মমতার প্রতি যে রমেন অবিচার করেছে একথা সবসময়েই মনে হয়। প্রথম প্রথম ভেবে খারাপ লাগত যে এমন একজন ভালো মেয়ের স্বামীকে আমি ছিনিয়ে নিলাম তার কাছ থেকে। এখন মনে হয়, রমেনের মতো শনিকে তার কাছ থেকে সরিয়ে এনে তার পরম হিতাকাঙ্ক্ষীর কাজ করেছি।

রমেনের সঙ্গে ঘর করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। হয়তো আমার পক্ষেও নয়। কিন্তু কী করব? দাদা বাবা মা দিদিমা সকলেই বলেছিল এমন করিস না। তাদের প্রত্যেকের সামনে তুড়ি বাজিয়ে বলেছিলাম যে, তোমরা দেখো, দেখে নিও যে, আমি ভুল করিনি।

আমার মনে মনে এই জেদ ছিল যে, ও খারাপ হলেও, ওর সব দোষ থাকলেও, ওকে আমার গুণে আমার নিজের মতো করে নিতে পারব।

কিন্তু পারলাম কই?

আর পারলাম যে না, এ জানাটা দিনে দিনে আমার কাছে যতই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ততই আমার অসহায়তা বাড়ছে। আমি জীবন থাকতে, আমার জ্ঞান থাকতে, কখনো বলতে পারব না, স্বীকার করতে পারব না, বাবাকে গিয়ে জানাতে পারব না যে আমি ভুল করেছি, আমাকে একজন ঠগ মর্মান্তিকভাবে ঠকিয়েছে। সে কথা বললে, নিজের কাছে, নিজের বিচার-বিবেচনা, নিজের গর্ব, দম্ভ নিজের সমস্ত কিছু আমিত্বর কাছেই যে আমি চিরদিনের মতো হেরে যাব।

তাই রমেন আমাকে লাথি মারলেও তা আমায় সহ্য করতে হবে। তাকে যে আমি অনেক সাধ করে একদিন মালা পরিয়েছিলাম। অনেকে সেদিন বলেছিল, 'বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা'। তবুও ভেবেছিলাম, বাঁদর বশ করা কী এতই কঠিন? দেখবে তোমরা, আমি ওকে কী একজন তৈরি করি, পুরুষের মতো পুরুষ।

আজ বিয়ের পর প্রায় আড়াই বছর কেটে গেছে—কিন্তু পারিনি।

এখনও শরীরটা বড় ভীষণভাবে আমাদের সম্পর্কটাকে ছেয়ে আছে। মানা করি, যাই করি, ভালো লাগুক কী না লাগুক, একটু সময় পরে, আমার অজান্তে আমি আমার শরীরের দাসী হয়ে যাই। আমার মতো নরম লাজুক মেয়েও যে এমন হঠাৎ নির্লজ্জ হয়ে উঠতে পারি—সমস্ত মানসিক অবরোধ, ভালো লাগা ভুলে গিয়ে শুধু অন্য একটা পুরুষের শরীরের কাছেই সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে পারি—এ কথা অন্য সময় ভাবলে আমার লজ্জা হয়।

আসলে আমরা মেয়েরা ঠিক কতখানি শরীর-নির্ভর আমরা নিজেরাই হয়তো তা জানি না। জানলে, আমাদের ন্যাকামিগুলো হয়তো একটু কমাতে পারতাম। কিন্তু সত্যিই বলছি, ঘুমপাড়ানো শরীরের আমরা, আর ঘুমজাগানো শরীরের আমরা একেবারে আলাদা আলাদা মানুষ। আমি জানি না, আশা করি পুরুষরা কোনোদিন আমাদের সত্যি সত্যি বুঝতে শিখবে। আমাদের বিভিন্ন সত্তাকে সম্মান করতে শিখবে।

ভদ্রলোক কতক্ষণ বসবার ঘরে বসেছিলেন, খেয়াল ছিল না। থলে হাতে আমাকে ঢুকতে দেখে অপ্রতিভ হয়ে বললেন, বাজারে যাচ্ছেন? আমি আসি তাহলে।

আমি বললাম—আসবেন কেন? চলুন না বাজারে আমার সঙ্গে। আজকে ছুটির দিন তো—একা একা বাজারে ঐ ঠেলাঠেলির মধ্যে যেতেও ইচ্ছে করে না।

সুশান্ত বলল, বেশ তো। চলুন।

—আপনার কাজের কোনো ক্ষতি করলাম না তো? বললাম আমি।

—তা একটু করলেন বইকি।

—কী কাজ?

—এই ভেবেছিলাম, শার্টের বোতামগুলো সব ঠিক করে লাগাব। ধোপাটা এমন বিনা কারণে আছাড় মারে না, সব ক'টা বোতাম সব শার্টেরই প্রায় ছিঁড়ে এসেছে।

আমি হেসে ফেললাম।

ও বলল, হাসছেন যে?

বললাম, কেন জানি, আমার খুব হাসি পায়। কোনো লম্বা-চওড়া পুরুষমানুষ মনোযোগ সহকারে বালিশের ওয়াড় অথবা পায়জামার দড়ি কিংবা জামার বোতাম লাগাচ্ছে দেখলেই আমার হাসি পায়। কিছু মনে করবেন না।

—তা আর কী করা যাবে?

হাসি হাসি মুখে বলল সুশান্ত। সকলের তো আর রমেনবাবুর মতো স্ত্রী নেই। লক্ষ লক্ষ ব্যাচেলার লোকেরা নিজেরাই ওসব করে।

—না করে উপায় কী?

—তারা করে করুক, আপনার করতে হবে না। আমাকে পোঁটলা করে সব দিয়ে যাবেন, আমি লাগিয়ে দেবো।

—বাঃ তাহলে তো ভালোই হয়। আমি আসলে পারিও না, জানেন? দেখুন না, আসবার আগেই আঙুলে অনেকখানি ছুঁচ ঢুকে গেছে।

ওর হাতটা আমার হাতে তুলে নিয়ে দেখলাম।—তাইই তো! ঈসস্।

পরমুহূর্তেই ওর চোখ আমার চোখে লাগল।

আমরা দুজনেই কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারলাম না।

রমেন আমাকে ভীষণ ভীষণ আদর করলেও আমার এত ভালো লাগে না, সুশান্ত চোখ তুলে তাকাতে আমার যেমন লাগল।

কেন এমন হল? কেন এমন হয়? ভাবতে লাগলাম আমি।

একজনের চোখ চাওয়ায় এমন হয় অন্যজনে নিরাবরণে আলিঙ্গন করলেও তা হয় না। কেন? এ কেন হয়?

সুশান্ত বলল, চলুন যাবেন না?

চলুন। বলে ঘরের পাল্লা ভেজিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে আমরা পথে নামলাম।

সুশান্ত ছাতাটা খুলল। বলল, আসুন, আমার দিকে সরে আসুন, রোদ লাগবে না। নাকি, রমেনবাবু দেখতে পাবেন?

আমি বললাম, ঈসস্ দেখলেই বা—। আমি কাউকে কেয়ার করি না।

—না করলেই ভালো।

—রাখুন তো। এই রোদে ছাতার তলায় যাচ্ছি, তার আবার কৈফিয়ত। আমি বললাম।

আমার কিন্তু বেশ লাগছিল।

সুশান্তর বুকের কাছে আমার মাথা। সুশান্তর গায়ের গন্ধটা বেশ। মিষ্টি মিষ্টি। রমেন বড় পাউডার

মাখে। পাউডারের গন্ধ ছাপিয়ে ওর গায়ের নিজস্ব গন্ধটা কখনো বুঝতে পাইনি! তাছাড়া ওর বোধহয় নিজস্ব কিছুই নেই, দু'একটা অতি অবশ্য জিনিস ছাড়া। ওর সবই পরস্মৈপদী। ওর ব্যক্তিত্বটাও তাই। সব সময়ে ও যেন অন্য কারো চরিত্রে অভিনয় করে। অভিনেতা হিসেবে ভালো হলেও কথা ছিল, অভিনয়ও করতে পারে না ও ভালো করে।

পথ গরমে ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। পথের পাশের সোনাঝুরি গাছ থেকে ফুল ঝরে পড়েছিল পথে। ইউক্যালিপটাসের শুকিয়ে ওঠা পাতার গন্ধে গরমের সকাল ম' ম' করছিল। সুশান্তর পাশে পাশে হ্যাজেল রোড দিয়ে হেঁটে যেতে বেশ লাগছিল।

রমেন যদি পুরুষমানুষ হয়, যদি এই কোম্পানির কাজে বরাবর লেগে থাকে, যদি সৎভাবে খাটে, তবে হয়তো হ্যাজেল রোড কী গাড়ুয়া রোড কী পার্ডি রোডে থাকবে প্রোমোশন হলে। বেশ লাগে আমার, এই কাইজার বাংলোগুলো। জানি না, কী হবে।

কত কী-ই তো ভাবি কত কী-ই-ই তো ভালো লাগে। তার চেয়ে এই মুহূর্তের ভালো লাগাটা দিয়ে মন ভরেনি।

বেশ লাগছে সুশান্তর বুকের কাছের, ছাতার নীচে আস্তে আস্তে পথ চলা। রমেনের আসলে দারুণ চটক ছিল একটা, হয়তো এখনও আছে। যে চটক দেখে আমি ভুলেছিলাম। এখন বুঝতে পারি মলাটটাই সব নয় কোনো মানুষের। মলাটের অন্তরালে যা থাকে সেইটেই সব।

বিয়ের পর পরই ও আমাকে একটা দারুণ মিথ্যা কথা বলেছিল, বলেছিল ওর একটা লিফট্ হয়েছে, ও কভেনান্টেড অফিসার হয়ে গেছে, শিগগিরই ট্রেনিংয়ে যেতে হবে ওকে হায়দরাবাদ না কোথায় যেন। আমি জানি যে ও মিথ্যা কথা বলেছিল এবং ও-ও জানে যে ওর মিথ্যা কথা ধরা পড়ে গেছে।

তখন কোনো ভালো ফ্ল্যাটে গেলে, কোনো সাদা-রঙা ছোট ছিমছাম গাড়ি দেখলে, আমি হাঁটতে হাঁটতে ওর হাত জড়িয়ে ধরে বলেছি, তুমি এমন ফ্ল্যাট পাবে কখনো?

ও বলেছে, নিশ্চয়ই।

তখন বলেছি, আমরা কবে এমন গাড়ি কিনব?

ও বলেছে, শিগগিরই।

তখন এসব কিছুই অবিশ্বাস করিনি। অবিশ্বাসই যদি করব, তাহলে সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে গ্রহণ করব কেন? তখন বিশ্বাস করতাম, সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু এখন আর করি না। কারণ আমি জেনে গেছি যে, ও একটা শঠ, ও একটা মিথ্যেবাদী প্রবঞ্চক।

ও চাকরিতে উন্নতি করেনি, করবে না কোনোদিনও, একথা জেনে বা অন্য দশজন মেয়ের মতো আমার ভালো ফ্ল্যাট হবে না বা গাড়ি হবে না বলে আমার কোনো দুঃখ নেই। সে তো কত মেয়েরই থাকে না। দুঃখটা সে জন্যে নয়। দুঃখটা এই জন্যে যে আমার-জেদকে জেতাতে গিয়ে আমি আমার সম্মান আর বুদ্ধিকে এমনভাবে হারিয়ে দিলাম। আমাকে ও এমন মর্মান্তিকভাবে ঠকালো এ কথাটাই আজকাল আমাকে বড় পীড়িত করে, বড় ক্লান্ত, অবসন্ন করে রাখে সবসময় ; সে ক্লান্তিটা এই জামশেদপুরের গরমের চেয়েও বেশি ক্লান্তিকর।

আসলে আমরা মেয়েরা, মানি আর নাই মানি, এখনও মেয়েদের সবচেয়ে বড় পরিচয় তাদের স্বামী। আমরা নিজেরা যতই গুণবতী হই না কেন, যাকে নিয়ে জীবন, যার হাতে মাথা রেখে শোওয়া, যার পাশে পাশে জীবনের পথে হাঁটা, সে যদি আমার মাথা ছাড়িয়ে আমার পাশে দৃশ্যমান হয়ে না প্রতিভাত হয়, সে যদি আমারই ছায়া হয়, আমারই অনেক গয়নার এক অপছন্দসই গয়নার মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তাহলে আমার নিজের সম্মান কোথায় থাকে?

যখন কলেজে পড়তাম তখন ন'বউদি বলত, দেখিস, যাকেই বিয়ে করবি, দেখে করিস, তার মধ্যে যেন সম্মান করবার মতো কিছু থাকে। যাকে সম্মান না করা যায়, শ্রদ্ধা না করা যায়, তাকে কখনো বিয়ে করিস না। সুখী হবি না।

তখন ভাবতাম, ন'বউদি বেশি বোঝে। ভাবতাম, আমি কী আর কচি খুকি? আমার কী আর বুদ্ধি নেই?

তখন বুঝতে পারিনি যে আমার সত্যিই বুদ্ধি নেই। ভালোবাসা ব্যাপারটার মূল ও স্থায়ী উপাদান যে সম্মান তখন তা বুঝতে পারিনি।

রমেন প্রায় হাতে-পায়ে ধরত, বলত আমাকে না হলে বাঁচবে না ; তারপর ওর নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ও এত সব কথা বানিয়ে বলত যে ওর উপর কখন নিজের অজান্তে দয়া করে ফেলেছিলাম। আত্মীয়স্বজনের বিরোধিতা, আমাকে ভীষণ জেদি করে তুলেছিল, মন বলেছিল যে যাকে আমার ভালো লাগল তাকে তোমাদের একটুও ভালো লাগল না? আমার উপর তোমাদের একটুও ভরসা নেই কেন?

এ সব মিলিয়ে ব্যাপারটা ঘটে গেল। বাবা অনেক ধার করলেন বাজারে। সে সময়ে বাবার ব্যবসাটা ভালো যাচ্ছিল না, তাই ধার করলেন, দাদারা প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে টাকা ওঠালেন, কিন্তু যে করেই হোক আমার বিয়েতে জাঁকজমক কিছু কম হল না। রোশনচৌকী বসল, হাজারখানেক লোক খেল, শুধু খেলই নয়, খেয়ে সব বাহা! বাহা! করল।

পেছনে চাইলে এখন বুঝতে পারি, আমার বিয়েতে কোনো কিছুরই বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না, ত্রুটি যতটুকু ছিল, তা ছিল আমার সঙ্গী নির্বাচনে। যে এসে মখমলমোড়া সিংহাসনে বসেছিল—শুধু তাকেই চিনতে আমার ভুল হয়ে গেছিল। নইলে ফুলের সাজ, ফ্রায়েড রাইস, আতরের পিচকিরি, ফার্নিচারের পালিশ, গয়নার ডিজাইন, বিয়ের বেনারসী, বিভিন্ন-রঙা শাড়ির সঙ্গে মানানসই নানারঙা শায়া সবকিছুই পারফেক্টলি মানানসই হয়েছিল। সেদিন যদি জানতে পেতাম যে আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিনে আমি একটা সবচেয়ে অসুন্দর ভুল করলাম, তাহলে হয়তো সেদিন অমন হাসতে পারতাম না ; ফোটোগ্রাফারের দিকে তাকিয়ে শুভদৃষ্টির সময় অমন তনুজার মতো ভুরু তুলে তাকাতে পারতাম না।

যাঁরা আমার নিজের এই জবানবন্দি পড়ছেন, তাঁরা হয়তো ভাবছেন যে আমি ডাইভোর্স কেন করছি না এখনও রমেনকে। বিশেষ করে আমার সহপাঠিনী, আমার বন্ধু-বান্ধবী, আমার পরিচিতরা, যাদের কাছে বিয়ের আগে আমি সদম্ভে বারংবার ঘোষণা করেছিলাম যে একটু এদিক-ওদিক হলে, আমার মনঃপূত না হলেই আমি যাকে বিয়ে করব তাকে ডাইভোর্স করব—যাতে সেপারেশন হয় তাই-ই করব। তাদের আমি আজ কী করে মুখ দেখাব?

ওসব কথা শুধু আমি কেন, হয়তো আমার বয়সি সব মেয়েরাই বলে ও ভাবে—আধুনিকা ও শিক্ষিতা সব মেয়েরা।

কিন্তু এখন আমি জানি বলা যত সহজ, করা তত নয়। এই জন্যে নয় যে, করা অসম্ভব। করা খুবই সম্ভব, কিন্তু ডাইভোর্স করতে কঠিন হতে হয়। আমরা বেশির ভাগ মেয়েরাই কঠিনহৃদয় নই। এমনকী আজকেও যত ডাইভোর্স হচ্ছে, তার দশগুণ বেশি ডাইভোর্স হওয়ার কথা ছিল।

আমরা জ্বলে-পুড়ে মরি, প্রতিবাদ করি, তারপর যেই আমাদের মতো মেয়েদের মিথ্যাবাদী, অপদার্থ, রেসুড়ে, জুয়াড়ি, মাতাল ও দুশ্চরিত্র স্বামীরা বাড়ি ফেরে, তাদের পরিচিত মুখের দিকে চেয়ে আমরা আমাদের সব অভিযোগ ভুলে যাই। তাদের খাবার দিই। তাদের কীসে আরাম হবে দেখি, তারপর ওরা নির্লজ্জের মতো (নির্লজ্জের মতো কেন বলি, বলা উচিত ধুরন্ধরের মতো)

আমাদের সরল মন ও নরম শরীরের বেলাভূমিতে নামে। ওদের সব অপারগতার একমাত্র সমস্যা একটা বিশেষ বর্ম দিয়ে ওরা ঢেকে রাখতে চায়। গা জ্বালা করে।

রমেনের কাছে যেতে আমার ঘেন্না হয়, অথচ তবু একসময় কাছে যাই। একসময় ঘেন্নার অনুভূতিটা চলে গিয়ে একটা উদাসীনতার অনুভূতি আসে, তারপর একটা সময়, হয়তো একটা ক্ষণিক মুহূর্তের জন্যে আমার সব ঘৃণা, সব উদাসীনতা, সমস্ত ছুঁড়ে ফেলে আমি পৃথিবীর সবচাইতে সুখী রমণী হয়ে উঠি।

একটি বিশেষ মুহূর্তে—একটি ক্ষণিক জয়ে জয়ী হয়ে রমেনরা ওদের স্বামীত্বের মেয়াদ আবার কিছুদিন বাড়িয়ে নেয়। পরদিন, সারাদিন, কাজের ফাঁকে ফাঁকে কেবলি মনে হয় আর কোনোদিন ঐ জন্তুটার, যে আমার সবচেয়ে বড় আপন, যাকে আমার শ্রদ্ধা করার কথা ছিল, যাকে আমার ভীষণ ভীষণ ভালোবাসার কথা ছিল, সেই মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক জন্তুটাকে কিছুতেই আর আমার কাছে আসতে দেব না।

আমি জানি না, কেন এমন হয়। হয়তো সারাদিন মেয়েদের সঙ্গে চেঁচামেচি করে ও তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবে এত ক্লান্ত থাকি যে বাড়ি ফিরে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আর ভাবার সময় পাই না। মন বলে, বর্তমানে তো বাঁচি, আজকের দিনটা তো কাটুক, তারপর কাল সকালে উঠে ঠান্ডা মাথায় একটা কর্তব্য ঠিক করা যাবে। কিন্তু সকাল হতে না হতেই তো স্কুলের তাড়া, রমেনের কারখানার তাড়া, দৌড়াদৌড়ি করে কখন যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়, বিকেল গিয়ে রাত আসে, বুঝতে পারি না। বাড়ি ফিরে, জামাকাপড় খুলে অনেকক্ষণ ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকি। তারপর অনেকক্ষণ আরাম করে চান করি। চান করার পরে শরীর ও মন ঠান্ডা হলে অনেক কথা মনে হয়। অনেক কিছু কর্তব্যের কথা। কিন্তু বাথরুম থেকে বেরিয়ে আর কিছু মনে থাকে না।

২

সুশান্ত বলল, কী হল। চুপচাপ যে?

—এই, ভাবছি।

—কী ভাবছেন এত?

—ভাবনা কী দেখানো যায়?

—না তা যায় না, তবে হয়তো ইচ্ছে করলে শোনানো যায়।

—হয়তো শোনাতে ইচ্ছে করছে না।

—তাহলে থাক।

পেট্রোল-পাম্পটার কাছাকাছি পৌঁছে আমি বললাম, আপনার বাজার হয়ে গেছে?

—না।

—কেন?

—আজকে আমার বাহন আসেনি। ময়ূরের সানস্ট্রোকের মতো হয়েছে কাল। যা গরম, আর দোষ কী শরীরের।

—কী নাম বললেন? ময়ূর? আপনার বাহনের নাম ময়ূর? তাহলে আপনি হচ্ছেন কার্তিক।

সুশান্ত হেসে উঠল। বলল, এমন কথা বলেন না আপনি।

—ময়ূর আসেনি, তাহলে দুপুরে খাবেন কোথায়? শুধোলাম আমি।

—চলে যাব বিষ্টুপুর। সেখানে পাঞ্জাবি হোটেলে রুটি-তড়কা খেয়ে নেব।

—থাক, এই রোদে আর রুটি-তড়কা খেতে এতদূরে মোটর সাইকেল ফটফটিয়ে যেতে হবে না।

—তবে কী উপোস করব? তাছাড়া আমার মোটর সাইকেলের উপর আপনার এত রাগ কেন?

—রাগ না, আমার ঐ শব্দটা শুনলে বিরক্তি লাগে। আর মনে হয় কেমন সুড়সুড়ি লাগে।

—হাসালেন আপনি। মোটর সাইকেলের আওয়াজে সুড়সুড়ি লাগে এমন কথা তো কখনও শুনিনি।

আমি বললাম, সত্যি। তারপর বললাম, মোটর সাইকেল চড়েন কেন?

—গাড়ি কেনার সামর্থ্য নেই বলে। তাছাড়া, এইরকম শহরে গলাকাটা ট্যাক্সিভাড়া দিতে পারি না। বাসের ভরসায় থাকলে তো চাকরি রাখা যাবে না।

—মোটর সাইকেল চড়া কিন্তু খুব ভয়ের।

—অ্যাকসিডেন্টের কথা বলছেন?

—না। অ্যাকসিডেন্ট তো আছেই। তাছাড়া কুকুর কামড়ানোর ভয়।

সুশান্ত এবারে হো হো করে হেসে উঠল। বলল, বাঃ বাঃ, আপনি সব নজর করেছেন তো।—সত্যি! সাধু সাহেবের কুকুর দুটো ভারী পাজি। আমাকে আসতে দেখলেই এমন তাড়া করে দু'পাশে। সত্যিই ভয় হয় কবে কামড়ে দেবে।

—ওদের বোধহয় আমার মতো সুড়সুড়ি লাগে ঐ ফটফট আওয়াজটাতে। তবে সত্যি বলছি—আমার এক জামাইবাবুকে কলকাতার এক পাগলা কুকুর মোটর সাইকেল ধাওয়া করে কামড়ে দেওয়ার পর তিনি মোটর সাইকেলটাই বেচে দিলেন। তাছাড়া এপাড়ার সাধু সাহেবের কুকুর ছাড়াও বে-পাড়ার অসাধু সাহেবদের কুকুররাও কী কম আছে জামশেদপুর শহরে?

সুশান্ত হাসল, বলল, আপনার সঙ্গে কথায় পারব না।

বাজারে ঢুকে বললাম, বলুন, কী মাছ খেতে ভালোবাসেন আপনি?

—আমি তো মাছ খাই না।

—সে কি! মাছ খান না কেন?

সুশান্ত একটু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, আমার ছোটবোন মাছ খেতে খুব ভালোবাসত। একেবারে মাছের পোকা ছিল। মাস ছয় আগে ও হঠাৎ মারা যায়। তারপর থেকে মাছ খাই না। এমনিই খাই না। কোনো কারণ নেই!

আমি কিছু বললাম না। মাছ না খেয়ে মৃত বোনকে কীভাবে ভালোবাসা দেখানো হয় বুঝি না। তবে সুশান্তর মনটা ভারী নরম। ওর চোখ দেখলেই মনে হয়।

আমি কোনো কথা বললাম না। তারপর শুধোলাম, তাহলে মাংস কিনি?

—মাংস! বলে সুশান্ত একবার আমার দিকে তাকাল। বলল, আমার জন্যে ব্যস্ত হবার কী আছে। তাছাড়া আপনি কিনবেন কেন? আমিই কিনি। মুরগি কিনি।

—না না, এই গরমে মুরগি খাওয়া যায় না। তার চেয়ে ছোট খাসির মাংস আছে, মাংসই কেনা ভালো।

—আপনি কেন কিনবেন? আমি কিনব।

—প্লিজ। বলে সুশান্ত একবার তাকাল আমার চোখে।

চশমার আড়ালে ওর কালো গভীর চোখের দিকে চোখ পড়ল আমার।

ওর চোখে কী যেন একটা আছে। ও মুখে যত কথা না বলে চোখে বলে তার চেয়ে অনেক বেশি। ও কিছু বললে, কিছু আবদার করলে, উত্তরে 'না' বলা বড় শক্ত। অস্বস্তির কথা এই যে,

এ সব লোক সহজে অথবা সস্তা কিছু চায় না কখনো।

সুশান্তকে একটু বেশি ভালো লেগে যাচ্ছে আমার। মনে মনে নিজেকে এক ধমক লাগালাম। মেয়েদের ধমকে ধমকে নিজেকেও ধমকাতে শিখেছি আমি।

মাংস কিনল সুশান্ত। আমি কিছু আনাজ কিনলাম। পটল, আলু, পোস্ত, কাঁচা-কলাইয়ের ডাল। এ গরমে কাঁচা-কলাইয়ের ডাল ছাড়া আর কিছু খেতে ভালো লাগে না। কাঁচা-কলাইয়ের ডাল আর পোস্তর তরকারি।

বাজার থেকে বেরিয়ে গরমটা যেন আরও বেশি লাগতে লাগল।

সুশান্ত বলল, ঈস্‌স্‌, গরমে আপনার মুখটা লাল হয়ে গেছে।

—গরমেই লাল হয়েছে কী করে বুঝলেন?

—তাহলে?

বলে সুশান্ত থেমে গেল আমার দিকে চেয়ে। মুখ নামিয়ে নিল।

আমি জানি, সুশান্ত আমাকে খুব পছন্দ করে। বিয়ের আগে আগে বিশেষ বিশেষ ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে যেমন দুষ্টুমি করতাম, তেমন দুষ্টুমি করলাম একটা সুশান্তর সঙ্গে।

আমার দিদিরা বলত, তুই এক নম্বরের পাজি। ছেলেগুলোকে এমন নাজেহাল করিস না।

দিদিরা যদি দেখতে পেত যে আজ সেই আমি সত্যিই কেমন নাজেহাল হচ্ছি রমেনের কাছে। ভাগ্যিস মনে মনে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলা যায়, নইলে দিদিরা একথা শুনতে পেলে বলত, কেমন? বলেছিলাম না? তখন কত করে বলেছিলাম এমন ভুল করিস না।

দিদিদের মরে গেলেও বলব না। তার চেয়ে বলব, রমেন খুব ভালো ছেলে। কালই তো ছোড়দিকে চিঠি লিখলাম—দারুণ চিঠি—আমি কী দারুণ আছি, কী ভীষণ সুখী আমি, এসব কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বানিয়ে-টানিয়ে ডাইরেক্টলি-ইনডাইরেক্টলি লিখলাম।

আমি ভাবছিলাম, তোমরা জানো না দিদি। আমি মরে গেলেও কখনও স্বীকার করব না যে, আমি ভুল করেছি, স্বীকার করব না যে রমেন ভালো ছেলে নয়।

রমেনকে ছাড়লেও ভবিষ্যতে ছাড়ব, এই মুহূর্তে রমেন খারাপ এ কথা আমার পক্ষে মানা অসম্ভব। আমি ভুল করেছি এ কথা বলা অসম্ভব।

কী করব বল ছোড়দি? বলো বাবা? নিজের সম্মান কি নিজে এমন করে নষ্ট করা যায়? সম্মান ছাড়া কি কেউ বাঁচে? বলো?

সমস্ত কষ্ট আমি নিজে সহ্য করব। তোমাদের এর মধ্যে জড়াব না। ডিসিশান যখন আমি একাই নিয়েছিলাম, এর কনসিকোয়েন্সের দায়িত্ব তো আমার! আমার নিজের কাছে আমি সৎ। বাবা, তুমি আমাকে দোষ দিও না। তোমাকে দু'মাস দেখি না। প্রতি সপ্তাহেই ভাবি রাউরকেল্লা এক্সপ্রেসে চলে যাব কলকাতা শনিবার রাতে। কিন্তু যাওয়া আর হয় না। এ মাসে যাবই। বাবার জন্যে আম নিয়ে যাব একঝুড়ি। বাবা আম খেতে বড় ভালোবাসেন। বাবা, তুমি কেমন আছ বাবা? তুমি এখন কী করছ? আজ তো রবিবার। বেলা দশটা। তোমার তৃতীয় কাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে—তুমি এখন তোমার ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছ। খবরের কাগজ পড়াও শেষ।

আমার বাবার মতো একটা সুন্দর মুখ আমি এ পর্যন্ত দেখলাম না। আমার বাবার মতো আদর করতেও দেখলাম না কাউকে। দিদিদের কাছে শুনেছিলাম, বিয়ের পরদিন আমি শ্বশুরবাড়ি গেলে বাবা নাকি ছাদে গিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদেছিলেন। বাবাকে কখনও আমি কাঁদতে দেখিনি জীবনে।

বাবা, আমি ভালো আছি, দারুণ সুখে আছি বাবা। এই দেখো না আমার পাশে সুশান্ত আছে। দেখো, বাবা, একবার দেখো। সুশান্ত ভালো ছেলে না? তোমার খুব ভালো লাগত ওকে, তুমি

যদি দেখতে। কী করব বলো, বাবা, সুশান্তরা আগে কোথায় ছিল, কোথায় লুকিয়েছিল, বুঝতে পারিনি। আমার সামনে তখন শুধু রমেনই ছিল। ছোড়দি যাকে 'পটানো' বলে, ও আমাকে তেমনি পটিয়েছিল। এখন বুঝি বাবা, যে ভালো ছেলেরা কাউকে কখনও পটায় না। তারা যা বলার, চোখের চাউনিতে বলে, সুন্দর চিঠিতে বলে, তারা কেউ এসে হাতে-পায়ে ধরে বিয়ে করতে চায় না। তারা তাদের আত্মসম্মান নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের ভালো লাগা জানাবার পর তারা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে—কোন্ শুভ মুহূর্তে আমরা সসম্মানে তাদের পাশে গিয়ে তাদের সম্মানিত করি এবং নিজেরাও সম্মানিত হই; সেই অপেক্ষায়।

কী করব বলো বাবা? ভুল করেছি।

তুমি তো বলতে বাবা, সবসময় বলতে ; মানুষ ভুলের মধ্য দিয়ে যা শেখে, তেমন করে আর কিছুই শেখে না। তুমিই তো বলতে বাবা যে, প্রত্যেকের জীবন তার নিজের নিজের। তার নিজের জীবনের নিয়ন্তা সে নিজে। বাবা নয়, মা নয়, দাদা নয় ; কেউ নয়। প্রত্যেকের অধিকার আছে নিজের জীবনে আর নিজের ইচ্ছে ও পছন্দমতো বাঁচবার। সেই অধিকার প্রয়োগ করতে তুমি তো আমাকে একবারও বারণ করোনি। অন্য সবাই-ই করেছিল, তুমি করোনি। যে ভুল করেছি, সে তো আমার ভুল। তুমি এজন্য কষ্ট পাও কেন, বাবা? এই ভুলের মধ্য দিয়ে কোনোদিন হয়তো আমি আবার কোনো বড় ও ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব। আমার জন্যে কষ্ট পেও না বাবা। লক্ষ্মী, সোনা বাবা।

আমি একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

সুশান্ত হঠাৎ বলল, কী হল?

আমি চমকে উঠলাম, বললাম, না। বাবার কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ে গেল। একবার কলকাতা যাব শিগগিরই। এখানে ভালো আম কোথায় পাওয়া যায় জানেন? বাবার জন্য আমি নিয়ে যাব একঝুড়ি যাবার সময়।

সুশান্ত বলল, জানি না, তবে খোঁজ নেব ; নিয়ে জানাব আপনাকে। কোনো বিশেষ আম কি?

—না। এমনি। ভালো ল্যাংড়া আম।

ততক্ষণে রোদটা সত্যিই দারুণ চড়া হয়ে গিয়েছিল।

সুশান্তর সঙ্গে বড় বড় পা ফেলে পথের পাশে পাশে যতটুকু ছায়ার সুযোগ পাওয়া যায়, সেই সুযোগ নিয়ে নিয়ে আমরা দুজনে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম।

মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া দিচ্ছিল। শুকনো পাতা, খড়কুটো, ঝরা ফুল সব ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে হঠাৎ হঠাৎ হাওয়ার ফুৎকারে হইহই করে আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছিল। গরমে চতুর্দিক ঝাঁ ঝাঁ করছিল। পাশে লোকজন ছিল না বললেই চলে। এই কদমা- সোনারি লিংকের আশে-পাশে লোকজন এমনিতেই কম।

যতই রোদ থাকুক, যতই গরম থাকুক, তবু হাঁটতে বেশ ভালো লাগছিল, দারুণ ভালো লাগছিল, সুশান্তর সঙ্গে। সুশান্তর সঙ্গ।

৩

গতকাল রমেনের ফ্যাক্টরির ফর্ম্যাল ওপেনিং সেরিমনি ছিল।

কাজে ও ঢুকেছে প্রায় ছ'মাস, কিন্তু এতদিন কারখানার কাজ পুরোপুরি চালু হয়নি। আমি ওসব বুঝি না। রমেন যা গল্প করত, তাই-ই শুনতাম।

এর আগে টেলকোতে কাজ করত ও। সে কাজ এক অজ্ঞাত কারণে রাতারাতি চলে গেল। কারণটা হয়তো রমেনের কাছে অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু আমার কাছে ও বানিয়ে বানিয়ে যা বলেছিল সেটাকে বিশ্বাস করার ইচ্ছা হয়নি আমার।

কিছুদিন কাজ ছিল না। আমার রোজগারই তখন একমাত্র রোজগার ছিল। আমি যা রোজগার করি, সে রোজগারে আমার স্বামীকে স্বচ্ছন্দে খাওয়াতে পারি, কিন্তু যে স্বামী নিজের দোষে নিজের চাকরি বার বার খোওয়ায় তাকে খাওয়ানোর ভাবনাটাও ভালো লাগে না। যোগ্যতা না থাকলে অন্য কথা ছিল, যোগ্যতা না থাকলে বিভিন্ন জায়গায় চাকরি পায় কী করে চটপট রমেন? তার যোগ্যতায় আমার সন্দেহ নেই ; আমার যত সন্দেহ ওর সততায়। পাওয়া চাকরি সে রাখতে পারে না। কোনো চাকরিই। তাছাড়া বড় কুঁড়ে ও।

কারখানায় যাবার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, রমেনের বিশেষ অনুরোধে আমায় যেতে হল।

রমেন বলেছিল, আমি গেলে নাকি ওর সম্মান বাড়বে, রমেনের যে আমার মতো একজন স্ত্রী আছে, তা জানলে কোম্পানিতে ওর কদর হবে।

জানি না, কদর হবে কি না ; কিন্তু রমেন একবারও বোঝেনি, যে আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারছিলাম যে, রমেনের যাই হোক, ওখানে গিয়ে আমি নিজেকে সম্মানিত করিনি।

কারখানার মোল্ডার, মেল্টার, লেবাররা সকলেই আমার দিকে কেমন অবাক চোখ তুলে তাকিয়েছিল। সকলের চোখেই লেখা ছিল, আরে? এ মেয়েটা রমেনের মধ্যে কী দেখল? এত ছেলে থাকতে তাকে বিয়ে করতে গেল কেন?

ডিরেক্টরদের স্ত্রীরা এবং অন্যান্য অনেকের স্ত্রীরাও এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আমার সমবয়সি দু'তিনজন ছিলেন। এ কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের মধ্যে প্রায় সকলেই কমবয়েসি। দারুণ দারুণ শাড়ি পরেছিলেন মহিলারা, কিন্তু দেখতে বেশির ভাগ পানওয়ালির মতো, একজনকে দেখতে অবিকল আমাদের ভবানিপুরের ভাড়াবাড়ির ঠিকে ঝি মোক্ষদার মতো।

কিন্তু হলে কী হয়, বাঘা বাঘা লোকেদের স্ত্রী তারা। সকলেই তাঁদের চারপাশে ভিড় করে আছে। কেউ ডিরেক্টরের ছোটো বাচ্চার নাকের পোঁটা রুমাল দিয়ে পুঁছছে, কেউ ছোটো মেয়েকে কাঁধে নিয়ে বেড়াচ্ছে, অন্য কেউ বউদিরা কখন কী বলবেন বা আজ্ঞা করবেন সেই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমি নিরুপমা চৌধুরী, যেহেতু আমি দেখতে ওঁদের সকলের চেয়ে ভালো, যেহেতু আমি ওঁদের সকলের চেয়ে শিক্ষিতা ও সকলের চেয়ে সুন্দর করে সেজেছি—এবং যেহেতু আমি রমেন ঘোষের স্ত্রী—আমাকে ওঁরা সকলেই কৃপার চোখে দেখতে লাগলেন।

আমি যে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলাম, আমাকে কেউ একটা চেয়ার এনে বসতে পর্যন্ত বলল না। অনেকক্ষণ পরে রমেন নিজেই কোথা থেকে একটা চেয়ার বয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমার জন্য পেতে দিল। ওর মুখ গরমে ঘেমে গিয়েছিল, আমাকে বলল, বোসো, তোমার গরমে কষ্ট হচ্ছে না?

কষ্ট আমার হচ্ছিল, সেটা গরমের জন্যে নয়, কী জন্যে তা রমেনকে বলে লাভ ছিল না তখন। রমেনের জন্যেও কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু সে কষ্টের চেয়েও বড় একটা কষ্ট, প্রত্যেক বিবাহিতা মেয়ের মনে যে কষ্ট মাঝে মাঝে হয় সেই কষ্ট আমাকে সে মুহূর্তে বড় পীড়িত করেছিল। নিরুপমা চৌধুরী নিজে যাই-ই হোক, তার চেহারা যাই-ই হোক, তার পারিবারিক পটভূমি যাই-ই হোক, তার শিক্ষা যাই-ই হোক, এই মুহূর্তে এই ইলেকট্রিক ফারনেসের পাশে দাঁড়িয়ে, তার স্বামীর কর্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তার বিন্দুমাত্র দাম নেই তার নিজের জন্যে। হয়তো কোনো বিবাহিত মেয়েরই নেই। এখনও, এই

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতেও স্বামীর পরিচয়ই মেয়েদের সবচেয়ে বড় পরিচয়। এটা ভালো কী মন্দ, ন্যায় কী অন্যায়, তা আমি জানি না, কিন্তু এটা মর্মান্তিকভাবে সত্যি।

আমার যে সব বন্ধু এখনও বিয়ে করেনি, কিন্তু ডেটিং করছে বা প্রেম করছে, আমার চেয়ে ছোটো যে সব মেয়েদের আমি চিনি না, অথচ যারা একদিন বাবা-মার অমতে আমার মতো জেদ করে নিজের মতামতকে ভীষণ রকম দামি ভেবে জীবনের পথে পা বাড়াবে, তারা যদি আমার এ লেখা পড়ে, এ কথা শোনে, তবে তারা হয়তো কিছু করার আগে দুবার ভাববে।

এই মুহূর্তের অনুভূতি আমি বোঝাতে পারব না কাউকে, আমার মতো অবস্থায়, এই রকম সিচুয়েশানে যদি অন্য কোনো বিবাহিতা মেয়ে কোনোদিন পড়ে থাকেন তবে একমাত্র তাঁরাই আমার দুঃখের কথা বুঝবেন। আমরা, এই বর্তমান যুগের, উদ্ধত ও অবুঝ মেয়েরা স্বীকার করি আর না-ই করি, এ কথা সত্যি যে, আমাদের বিবাহিত জীবনে একমাত্র আমাদের স্বামীরাই আমাদের যথার্থ সামাজিক সম্মান দিতে পারেন, স্বামী ছাড়া আর কেউই তা পারেন না। যতদিন সমাজ থাকবে, স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে বসবাস করতে হবে, নেমন্তন্নে, পার্টিতে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস দুজনেরই আমন্ত্রণ থাকবে, ততদিন আমাদের মতো সবজান্তা, বোকা ইমপালসিভ মেয়েদের এমনি করেই অপমানিত হতে হবে। এর কোনো প্রতিকার নেই। স্বামীদের বড়লোক হবার দরকার নেই, তারা যেন যথার্থ পুরুষমানুষ হয়, তাদের যেন যথার্থ ভবিষ্যৎ থাকে, তাদের জন্য আমরা যেন গর্বিত হতে পারি—এ ছাড়া আর কিছু রমেনদের কাছে চাইবার নেই, কোনোদিন ছিলও না আমাদের।

ওদের কারখানায় দুটো কিউপোলা কাস্ট আয়রন ফাউন্ড্রি, আর দুটো ইলেকট্রিক আর্ক ফারনেস। একটু পরে আর্ক ফারনেস দুটো চার্জিং হবে। বোতাম টিপবেন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের স্ত্রী। সে মহিলা মাঝবয়সি, মিষ্টি দেখতে, একটা অফ-হোয়াইট শাড়ি পরেছেন, হালকা বেগুনি পাড়, সঙ্গে হালকা বেগুনি ব্লাউজ, গলায় মঙ্গলসূত্রম।

আমি একা অন্যদিকে বসে আছি—ফারনেসগুলোর কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে অন্য সবাই বসে আছেন। লাইমস্টোন, পিগ আয়রন এ সমস্ত চার্জ করা হচ্ছে ফারনেসের ঢাকা খুলে, এমন সময় দেখি শেফালি আসছে।

শেফালি চ্যাটার্জি। আমাদের সঙ্গে কলেজে পড়ত--ভীষণ রোগা ছিল—এখনও আছে—পার্ট টু পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি।—শেফালি এত রোগা যে ও বরাবর শাড়ির নীচে দুটো শায়া পরত মোটা দেখাবার জন্যে—আজও পরেছে। আমাকে দেখেই ও হাসল, সোজা আমার কাছে এল—রোগা হলেও বেশ দেখাচ্ছে শেফালিকে--একটা লাল জমির উপর হলদে কাজ করা ঢাকাই পরেছে। ও বলল, বাংলাদেশ থেকে আনিয়েছে। শেফালি আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, নীরু? তুই এখানে? বেশ বাবা, বিয়ে করলি খবরও দিলি না। তোর বর কি এখানে কাজ করেন নাকি?

আমি ঘাড় হেলালাম।

—তোর বরের কী নাম? নিশ্চয়ই ডিরেক্টরদের মধ্যে কেউ? কথাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে শেফালির ফর্সা মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে এল।

আমি আবার মাথা নাড়লাম। রমেনের নাম বললাম। শেফালির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, বলল, ও! ও, তাই নাকি? তারপর বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, রমেনবাবু তোর বর? তার সম্বন্ধে শুনেছি আমার স্বামীর কাছে।

কী শুনেছে জিজ্ঞেস করার মতো বুকের জোর আমার ছিল না। পাছে ও নিজেই রমেনের সম্বন্ধে কিছু বলে বসে, তাই আমি তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে বললাম, তুই এখানে কোথায় থাকিস?

শেফালি বলল, কাইজার বাংলোয়—এদের কোম্পানিরও পাঁচটা বাংলো নেওয়া আছে ডিরেক্টরদের

জন্যে, আর—বলে কপাল থেকে চুল সরিয়ে বলল, আমার স্বামী তো ওয়ার্কস ম্যানেজার—দাঁড়া, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি—বলেই, শেফালি ফারনেসের দিকে চেয়ে যেখানে সকলে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিকে ডাকল, ওগো শুনছ।

শেফালির ডাকে সাদা কচ্ছপের মতো দেখতে বেঁটেখাটো গাবলু-গুবলু এক ভদ্রলোক আমাদের দিকে আসতে লাগলেন। ভদ্রলোকের পরনে কমলা-রঙা একটা টেরিলিনের প্যান্ট, গায়ে নীলরঙা ব্যাংলনের গেঞ্জি, চুলটা ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো—দেখেই বোঝা যাচ্ছে আগে পাশ ফিরিয়ে আঁচড়াতেন, বিয়ের পর শেফালির ডাইরেকশানে এই শাসন চুলের ওপর।

ভদ্রলোক বেশ ভালো মানুষ, দেখলেই মনে হয় পড়াশোনায় ভালো ছাত্র ছিলেন, এতদিন পড়াশোনা ছাড়া আর কিছুই করেননি, এখন আর সমস্ত কিছু, সাজ-পোশাক, চুলের কায়দা, স্মার্টনেস ইত্যাদি শেফালির প্যাকেজ-ট্রেনিংয়ে তাড়াতাড়ি সব শিখে নিচ্ছেন ; মানে শেফালি যেমন শেখাচ্ছে, তাই শিখছেন। নইলে কী এমন সাজে সাজেন কোনো ভদ্রলোক?

উনি নমস্কার করে বললেন, ওকি? আপনি এখানে একা বসে আছেন কেন? কী অন্যায় কথা! চলুন চলুন, ওদিকে চলুন, মেয়েরা সব একসঙ্গে বসবেন, গরমে একটু কষ্ট হবে, কী আর করবেন?

আমি হেসে বললাম, আমি কিন্তু বেশ হাওয়া পাচ্ছি, একটু এখানে বসি। ভিড় ভালো লাগে না।

উনি একটু পরে চলে গেলেন।

শেফালি বলল, গরমও পড়েছে, বল? আর সারাদিন এয়ারকন্ডিশান্ড ঘরে বসে থাকি, বাইরে বেরোলে এত কষ্ট হয় যে কী বলব। তুই তো আসবি না, আমিই যাই ওদিকে, বুঝলি?

শেফালি চলে গেল।

আমি বসে বসে ভাবছিলাম যে, একটু আগেই আমি যা ভাবছিলাম তা ঠিকই।

শেফালিকে আমি হিংসা করি না, তবু ক্লাসের পরীক্ষায় ফেল করা শেফালি—যাকে এই নিরুপমা চৌধুরী একজন নন্-এনটিটি বলেই জেনে এসেছে এতদিন, যার বলার মতো কোনো গুণই নেই—সেই শেফালি তার স্বামীর পরিচয়ে আজ আমার চেয়ে এইখানে অনেক বড় হয়ে রইল।

আমি হয়তো কখনো অমন ক্যাবলা ছেলেকে বিয়ে করতে পারতাম না—পড়াশুনায় সে যতই ভালো হোক না কেন—কিন্তু রমেনের মতো হ্যান্ডসাম অথচ শেফালির বরের মতো গুণী ছেলেও কলকাতায় বহু ছিল। তাদের আমার সঙ্গে দেখা হল না। প্রথম বয়সের ঘোরে, প্রথম জনকে দেখে, তার সস্তা সেলস্ম্যানশিপে ভুলে গিয়ে আমি তাকে গ্রহণ করলাম। এতগুলো লোকের সামনে একজন সন্দেহজনক চরিত্রসম্পন্ন চালিয়াৎ ও আত্মসম্মানজ্ঞানহীন স্বামীর স্ত্রীর পরিচয়ে এককালীন রূপে-গুণে চোখ-ঝলসানো আমি মাথা নীচু করে বসে থাকলাম।

কিছুক্ষণ পর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের স্ত্রী ফারনেস চালু করলেন। প্রচণ্ড শব্দ করে ফারনেস চালু হল। ইলেকট্রোডগুলো ধীরে ধীরে নেমে এল ফারনেসের মধ্যে। তারপর অতিকায় প্রেসার কুকারের মতো ফারনেসের মধ্যে ইস্পাত রান্না হতে লাগল। কিউপোলাগুলো অনেকদিন আগেই চালু হয়েছিল। আজ সেগুলো চলছে না। দারুণ উঁচু শেডের নিচে একা একা নিঃসঙ্গ হয়ে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো।

সকলকে খাবার দেওয়া হল। কারখানার সকলের জন্যে প্যাকেটে করে মিষ্টি, সিঙাড়া ইত্যাদি আনা হয়েছিল। আমাকেও কে যেন এনে দিল একটা প্যাকেট।

বাড়িতে রান্না করে এসেছিলাম, গিয়ে আরেকবার চান করে আরাম করে খাব—ঘামে ব্লাউজ, ভিতরের জামা ভিজে জব্ জব্ করছে। এখানে আর এক মিনিটও বসতে ইচ্ছে করছে না।

এখন অফিস বিল্ডিংয়ের মধ্যে এয়ারকন্ডিশান্‌ড ঘরে ডিরেক্টররা ও তাঁদের স্ত্রীরা সকলে বসে আছেন। শেফালিও আছে। নভেলটি থেকে বিয়ার এসেছে, নটরাজ থেকে চাইনিজ খাবার।

এখনও পর্দা-টর্দা লাগানো হয়নি বলে ঘরের মধ্যে কী হচ্ছে দেখা যাচ্ছে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম বাড়ি যাব বলে। রমেন এসে জিজ্ঞেস করল খেয়েছি কিনা। ও নিজে হাতে খুরিতে করে এক কাপ চা নিয়ে এল আমার জন্যে। চা-টা খেলাম। ফাই-ফরমাশ খেটে বেচারির চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। ওর দিকে তাকিয়ে আমার কষ্ট হল। শাড়িটা ক্রাশড্‌ হয়ে গেছিল, ঠিক করে নিয়ে আবার ওর মুখের দিকে তাকালাম।

আমার মনে হল ওকে বলি, আমার কোনো উপায় নেই তোমাকে সাহায্য করার। পুরুষমানুষরা একমাত্র নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করতে পারে।

ও বলল, সেন তার মোটর সাইকেলের পেছনে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

আমি শুধোলাম, তুমি যাবে না?

রমেন বলল, পাগল! মেটাল গলবে, পোরিং হবে। সকলে মিলে দেখতে হবে কেমন কাস্টিং হল, তারপর ল্যাবরেটরিতে কার্বন-কন্টেট পরীক্ষা হবে, কত ঝামেলা। ঝামেলা কী সোজা? সব শেষ করে যেতে যেতে আমার রাত হয়ে যাবে।

—রাত হয়ে যাবে তোমার?

—বাঃ হবে না? আমার ওপর কত দায়িত্ব। আমি না থাকলে হয়?

আমি কিছু বললাম না, কারখানার গেটের দিকে এগোতে লাগলাম। যখন অফিস বিল্ডিংয়ের কাছাকাছি এসেছি এমন সময় শেফালি দৌড়ে এসে বলল, এই নীরু, তোকে সকলে ডাকছেন।

কেন জানি না, আমার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু হেসে বললাম, কেন রে?

—তোকে যেতে দেখে ম্যানেজিং ডিরেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, "হু'জ দ্যাট প্রেটি লেডি"? যেই শুনেছেন যে তুই আমার বন্ধু, বললেন ডেকে আনতে। আয় না আমাদের সঙ্গে একটু চাইনিজ খাবি?

আমি বললাম, না রে। আমার তাড়া আছে।

শেফালি হাত ধরল, বলল, আয় না বাবা, এম.ডি. বলছেন।

আমার সত্যিই এবার রাগ হল, বলে ফেললাম, এম.ডি. কী ভগবান?

শেফালি চমকে উঠল। বলল, না। তা নয়। তবে তোর না হলেও তোর বরের ভগবান তো বটেই। তোর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর তোর বরের চাকরি নির্ভর করছে।

আমি হেসেই বললাম, তবে সে ভগবানের পুজো আমার স্বামীরই ব্যাপার, আমার নয়। তাই-না। বল?

তারপর কথাটাকে হালকা করার জন্যে বললাম, সত্যিই বলছি রে, গরমে অবস্থা কাহিল, দেখা করার মতো অবস্থা নেই।

শেফালি হালকা গলায় বলল, তোর মতো মেয়েকে যে-কোনো অবস্থাতে দেখতে পেলেই যে-কোনো পুরুষ ধন্য হয়ে যাবে।

পরক্ষণেই বলল, তোর আর তোর বরের সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল।

আমি আর কথাটাতে ফেনাতে দিলাম না। আমি জানি কী আলোচনা হয় ; কী আলোচনা হতে পারে। সে আলোচনা তো আমিও করি ; সবসময় মনে মনে। কিন্তু উপায় কী? মুক্তির এখনও কোনো উপায় নেই। হয়তো পরে কোনোদিন হবে। জানি না, সেদিন কবে হবে।

সেন গেটে দাঁড়িয়েছিল, ডাক দিল, বউদি আসুন, রোদে বেগুনপোড়া হয়ে গেলাম।

আমি পৌঁছতে ও এঞ্জিন স্টার্ট করল। ওর কোমর জড়িয়ে ধরে বসতে আমার লজ্জা করছিল।

মোটর সাইকেলের পেছনে বসলেই যে চালায় তাকে জড়িয়ে ধরে তার পিঠে বুক লাগিয়ে বসতে হয়, নইলে জামশেদপুরের এই ফাঁকা রাস্তায় যা জোর চালায় এরা, যে-কোনো মুহূর্তে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

সেন আমার ছোটো ভাইয়ের মতো। ওকে জড়িয়ে ধরতে লজ্জা নেই কোনো—কিন্তু সারা গা ভিজে গেছে ঘামে। আমার তো লজ্জা করবেই ; হয়তো ওরও লজ্জা করবে।

সেন ভটভটিয়ে বের হল বাইরে, তারপর জোরে ছোটাল তার মোটর সাইকেল।

বাতাসে আমার চুল উড়ছিল, আঁচল উড়ছিল। গরম হাওয়ায় চোখ শুকিয়ে যাচ্ছিল। অসহ্য গরম।

সেন যেন কী বলল। হাওয়ায় ওর কথাগুলো উড়ে গেল। আমার দু'হাতই আটকা। হাত বাড়িয়ে যে কথার টুকরোগুলো ধরব, তার উপায় ছিল না। চেঁচিয়ে বললাম, জোরে বল, শুনতে পাচ্ছি না।

সেন বলল, বলছি যে, মোটর সাইকেলের পেছনে আপনাকে মানায় না।

—তো, কীসে মানায়?

—ক্যাডিলাক গাড়িতে।

বললাম, ফাজিল।

একটু পরে সেন আবার বলল, বউদি, আপনার ছোটো বোন নেই?

হেসে বললাম, আছে। দু'বোন।

—আপনার মতো দেখতে?

—আমার চেয়ে অনেক ভালো দেখতে।

সেন মুখ ফিরিয়ে বলল, আমার জন্যে একটু কিছু করুন না বউদি।

আমি হাসলাম, বললাম, মুখ ফিরিয়ো না, অ্যাকসিডেন্ট হবে।

—আপনার সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট হলেও সুখ। তারপর বলল, আপনার সঙ্গে মরলেও দুঃখ নেই আমার।

আমি বললাম, কিন্তু আমার আছে। আমি আমার এই জীবনকে দারুণ ভালোবাসি।

—এই জীবনকে? সেনের গলা গম্ভীর শোনাল। বলল, বউদি আপনি বড় মিথ্যুক।

—কেন? এই কথা বলছ?

—এই জীবনকে আপনি সত্যি ভালোবাসেন? বলেই গতিটা আস্তে করল।

আমি বললাম, কোন্ জীবনের কথা তুমি বলছ জানি না—তবে জীবন তো আমাদের একটাই—জীবন হয়তো খণ্ড খণ্ড, টুকরো টুকরো বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা, তবু সব মিলিয়ে তো একটাই জীবন। সত্যিই আমি আমার জীবনকে ভালোবাসি।

বাড়ির দরজায় পৌঁছে পেয়ারাগাছের নীচে মোটর বাইকটা রাখল সেন। বলল, একটু বসে যাই।

বললাম, বসবে? এসো। কী খাবে বল? ঘোলের সরবৎ করে দিই? না লেমন স্কোয়াশ খাবে।

সেন উত্তর দিল না।

আমি তালা খুলে ভিতরে এলাম।

বসবার ঘরটা বাইরের তুলনায় অনেক ঠান্ডা।

সেন বলল, আঃ কী আরাম! আপনার ঘরটা কী ঠান্ডা বউদি।

সেন ভিতরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। আমি পাখাটা খুলতে গিয়েছিলাম, পাখা খুলে স্ট্যান্ড লাইটটা জ্বেলে ফিরেই দেখি সেন একেবারে আমার পেছনে।

কিছু বোঝার আগেই ও আমার কোমর জড়িয়ে ধরল, জড়িয়ে ধরেই আমার ঘামে ভেজা বুকে মুখ গুঁজল। পরক্ষণেই মানা করার বা বাধা দেওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়েই এমন একটা কাণ্ড করে বসল, যা আমি বলতে পারছি না।

ঠাস্ করে ওর গালে এক চড় লাগালাম আমি। ও তড়িতাহতের মতো সরে গেল। ওর চোখের দিকে চাইতেই দেখলাম ও আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, ওর চোখের কোণ জলে ভিজে উঠেছে।

সেন দেখতে কুৎসিত—কুচকুচে কালো রঙ, মোটা ধ্যাবড়া নাক, ছোটো ছোটো কদমছাঁট চুল, মোটা ঠোঁট, ওকে ওরকমভাবে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার গা জ্বালা করতে লাগল। আমি দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, বেরোও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও এখুনি—চেঁচিয়ে বললাম।

ঠিক সেই সময় দরজা ঠেলে সুশান্ত ঢুকল, অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে ও বলল, আমাকে বলছেন?

আমার কী যেন হয়ে গেল। মাঝে মাঝে আমার মাথার ঠিক থাকে না, বললাম, সবাইকেই বলছি, সবাইকেই বলছি বেরিয়ে যেতে।

তারপরেই বললাম, আমাকে একটু একা থাকতে দিন, প্লিজ আমাকে একটু একা থাকতে দিন।

সুশান্ত কিছু না বলে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

সেনও কোনো কথা বলল না। আরেকবার আমার দিকে তাকিয়ে চলে গেল। দেখলাম ওর দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছে।

হঠাৎ আমার মনে হল রমেন আমার কাছে যে মুখ নিয়ে আসে, সেনের এ মুখে সেই মুখের ছায়া নেই। সেনের সমস্ত মুখে কী যেন ভীষণ একটা কষ্ট ছড়িয়ে ছিল, সে কষ্টের কোনো ব্যাখ্যা আমি জানি না।

একটু পরে সেনের মোটর সাইকেলের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল কালীবাড়ির মোড়ের দিকে। দরজাটাতে ছিটকিনি দিয়ে আমি ঠান্ডা মেঝেতে শুয়ে পড়লাম।

আমি কী করব জানি না। এত অপমান, এতরকম অপমান আমার আর সহ্য হয় না। পাখার ব্লেডগুলো দেখা যায় না—পাখাটা 'অন'-এ ঘুরছিল। হঠাৎ মনে হল পাখার সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুললে কেমন হয়? কী করে ঝোলে লোকে? যারা ঝোলে, তারা হঠাৎ কখন সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছয়? হয়তো এমনই কোনো মুহূর্তে। আমি আজ সে মুহূর্তের সামনে এই অসহ্য গরম ও অসম্মানে দাঁড়িয়ে আছি।

আমার চোখ দিয়ে সচরাচর জল পড়ে না। কিন্তু ঠান্ডা মেঝেতে শুয়ে ঘুরন্ত পাখার দিকে চেয়ে দু'চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগল। ছিঃ, সুশান্ত কী ভাবল আমাকে। সুশান্ত এই মরুভূমির মধ্যে একমাত্র মরূদ্যান আমার, আমার এক এবং একমাত্র সম্মানের পাত্র, যে আমাকে সম্মানের চোখে দেখে ; সে আমাকে ভাবল, হয়তো সেনের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক আছে। ভাবল, সেনকে আর ওকে আমি একই চোখে দেখি।

জানি না কেন এমন হল, আমার কেন এমন কপাল হল? এত মেয়ে থাকতে শুধু আমার জন্যেই কী পৃথিবীর সমস্ত সমস্যা জমা হয়েছিল?

৪

বাইরে কখন প্রখর রোদের বেলা পড়ে এসেছিল বুঝতে পারিনি। বোধহয় অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন প্রায় ছ'টা বাজে। বাইরে পেয়ারাতলায় রোদের ফালিগুলো বেঁকে গেছে। একটা একলা বুলবুলি কোথা থেকে উড়ে এসে শুকনো ডালে বসে ফিস্ ফিস্ করে কী সব বলছে।

জানালাগুলো খুলে দিলাম। আমার দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। এই ভাড়া করা ফার্নিচার, এই ভাড়া করা গালিচা, এই ভাড়া করা জীবনের গ্লানি, এই অসম্মানের জীবন বড় দুর্বিষহ বলে মনে হচ্ছিল।

মুখী এলে, ওর ওপর ঘরদোর পরিষ্কারের ভার দিয়ে চান করতে গেলাম।

আমার সারা গা দিয়ে গরম ঝাঁঝ বেরোচ্ছিল।

বাথরুমে ঢুকে সমস্ত জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুমের আয়নার সামনে চুল খুলে দাঁড়ালাম শাওয়ারের নিচে। সারা শরীর বেয়ে ঠান্ডা জল গড়াতে লাগল।

ভালো করে বার বার অনেকবার সাবান মাখালাম সারা গায়ে মুখে, বুকে, তবুও ঘেন্না গেল না। সেন আমার শরীরের যেখানে যেখানে হাত দিয়েছিল সেই সমস্ত জায়গা তখনও জ্বলছিল—যেন ওর হাতে লঙ্কাবাটা ছিল। ঘেন্নায় গা রি রি করছিল।

জানি না, পুরুষগুলো কী আনন্দ পায়? এমন ইচ্ছার বিরুদ্ধে, রুচির বিরুদ্ধে, এমন অপমানকর পরিস্থিতিতে এক মুহূর্ত আমার বুক হাতের মধ্যে ধরে ও কী সুখ পেল তা ও-ই জানে।

জানি না, আমি মেয়ে, আমি, আমরা, কোনোদিনও হয়তো পুরুষদের এই লজ্জাকর প্রবৃত্তি-সর্বস্বতা ক্ষমা করতে পারি না।

সেনকে আমার ছোটো ভাইয়ের মতো দেখতাম, ঐ কালো কালো অল্পবয়সি ছোটো ছেলেটার জন্যে আমার মনের কোণে বেশ একটা আদুরে অনুকম্পার স্থান গড়ে উঠেছিল। ও এই এক মুহূর্তের স্পর্শের সামান্য পাওয়ার বিনিময়ে কেন যে এত বড় পাওয়াটাকে ধুলোয় ফেলে দিল তা ও-ই জানে ; পুরুষরাই জানে।

আয়নার সামনে সম্পূর্ণ নগ্না হয়ে দাঁড়ালে এখনও আমার গর্ব হয়। আমার ফিগারটা সত্যিই ভালো। নীলামে চড়ালে এর দাম কত হত জানি না। হয়তো এ এক বহুমূল্য বস্তু, অন্যদের চোখে, পুরুষের চোখে, কিন্তু এই সুন্দরী নারী-শরীরের আড়ালে যে একটা নরম ভালোবাসার কাঙাল কাঠবিড়ালির মতো মন আছে, সে মনটার খোঁজ কেউ রাখল না। এই সুন্দরী শরীর না থাকলে আমার—আমি কখনো রমেনের মতো লোকের শিকার হতাম না। সত্যিকারের সুন্দর মনের কেউ হয়তো একদিন আমাকে আদর করে, সমস্ত সম্মানের সঙ্গে তার ছোটো মধ্যবিত্ত সংসারের রানি করত।

কিছুই হল না।

আমি, এই উদ্ধত, সুন্দরী, সর্বগুণসম্পন্না নিরুপমা চৌধুরী আজ কিছু নিয়েই আর গর্ব করতে পারি না। গর্ব করার মতো কিছুই বুঝি আমার অবশিষ্ট রইল না আজ।

অনেকক্ষণ ধরে চান করার পর শরীরটা বেশ স্নিগ্ধ লাগতে লাগল। পয়লা বৈশাখে ছোড়দি একটা সাদা জমির ওপর হালকা হলদে পোল্‌কা ডটের খাটাউ ভয়েল দিয়েছিল। সে শাড়িটা বের করে পরলাম। হালকা হলদে রঙের ব্লাউজ পরলাম যা ঐ শাড়ির সঙ্গে মানায়। ফলস্ মুক্তোর সাদা মালা পরলাম একটা গলায়। ভুরুতে আইব্রো-পেনসিল মাখলাম—অনেকদিন ভুরু প্রিক করাইনি, একদিন করতে হবে। কেন জানি না, সেই অসম্মানের দুপুরের পর, সেই সন্ধের ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে অনেক অনেকদিন পর ভালো করে সাজতে আমার ভারী ভালো লাগছিল।

বিয়ের সময় বন্ধুরা মিলে একটা ইন্টিমেট সেন্ট কিনে দিয়েছিল। বিশেষ বিশেষ দিনে, যেদিন মন খারাপ থাকে, অথবা অত্যন্ত ভালো থাকে, আমি ঐ সেন্টটা মাখি। ইন্টিমেটটা বের করে ঘাড়ে, গলায় একটু মাখলাম। তারপর চটিটা পায়ে গলিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

কোথায় যাব জানি না, এখানে আমার তেমন জায়গাও নেই যাওয়ার ; তবু বেরোলাম।

মাঝে মাঝে এমন বোধহয় সব মেয়েরই হয়। দমবন্ধ-দমবন্ধ লাগে। কোথাও যাবার জায়গা নেই জেনেও বেরোতে হয়, পথে পথে ঘুরতে হয়, কোনো অপরিচিত পথিকের স্তুতিভরা চোখের আয়নায় নিজের ব্যক্তিত্বের ছায়া দেখে নিজেকে নতুন করে নিজে ভালোবাসতে ইচ্ছে যায়।

অনেকক্ষণ একা একা সোনারি লিংকে হেঁটে বেড়ালাম। কত রকম লোক হাঁটতে বেরিয়েছে। গরমের সন্ধে। একদল কাক আসন্ন সন্ধ্যার গান গাইছে সমবেত হ'য়ে। কোম্পানির কুকুরগুলোকে কে যেন ট্রেনিং দিচ্ছেন—পাশের মাঠে। বড় বড় অ্যালসেশিয়ান কুকুরগুলো লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, পরমুহূর্তেই শান্ত ও বাধ্য ছেলেদের মতো কথা শুনছে।

হাঁটতে হাঁটতে প্রায় এয়ারস্ট্রিপ অবধি চলে গিয়েছিলাম তারপর ফিরলাম। এখন পথে পথে আলো জ্বলে উঠেছে। অন্ধকার হয়ে গেছে সোনারির রাস্তা। মাঝে মাঝে তীব্র গতিতে বুকের মধ্যে চমক তুলে কোনো গাড়ি ছুটে চলেছে পথ বেয়ে।

কাইজার বাংলোগুলোর কাছে এসে মোড় নিলাম। মোড়েই একটা ফুলগাছ। বোধ হয় কেসিয়া নডুলাস্। পথটা ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে।

ফুলের গালচের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতেই আমার মনে বিদ্যুৎ চমকের মতো একজনের কথা মনে পড়ল। একটা ব্যথিত মুখ। মনে পড়তেই, বুকের মধ্যেটা মুচড়ে উঠতে লাগল।

কী আশ্চর্য! সেনকে বের করে দেবার পর থেকে সুশান্তর কথা একবারও আমার মনে পড়েনি। এই মুহূর্তে ফুল মাড়ানোর সময়ে কেন জানি না, আশ্চর্যভাবে সুশান্তর কথা মনে পড়ে গেল আমার। ইচ্ছে হল এক্ষুনি গিয়ে ওর কাছে ক্ষমা চাই। ওর কাছে দৌড়ে গিয়ে বলি, তোমাকে কিছু বলতে চাইনি, বলতে চাইনি গো, যা বলেছি তা আমার মুখের কথা ; মনের কথা নয়।

জানি না, কী এক অদৃশ্য টানে আমি বড় বড় পা ফেলে বাড়ির দিকে এগিয়ে চললাম।

সুশান্তর বাড়ি আমাদের বাড়ির পাশেই। পথে বেরোবার সময়ও ওর বাড়ির পাশ দিয়েই গিয়েছি, অথচ একবারও মনে পড়েনি ওর কথা তখন, অথচ এখন কী এক অজানা কারণে ও এমন করে টানছে আমাকে।

বাড়ির বাইরের দরজায় দেখি ওর বাহন ময়ূর সিঁড়িতে বসে আছে।

বললাম, দাদাবাবু আছেন না কি?

ময়ূর হেসে বলল, আছেন।

—খবর দেবে একটু যে, আমি এসেছি।

ময়ূর উঠে দাঁড়াল। বেশ চটপটে সপ্রতিভ ছেলে। বলল, খবর দেবার দরকার নেই। দাদাবাবু জানেন যে আপনি আসবেন।

—সেকি? তুমি কী করে জানলে?

—বারে। আমাকে উনি যে বললেন, বললেন পাশের বাড়ির বউদি এলে ভেতরে পাঠিয়ে দিবি।

আমি একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়ে ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবলাম। যেতে বড় সংকোচ হচ্ছিল। আমি কোনোদিনও যাইনি এ পর্যন্ত সুশান্তর বাড়ি। ওই বরাবর এসেছে। তাছাড়া একজন বিবাহিতা অল্পবয়সি মেয়ের পক্ষে একা একা ব্যাচেলারের বাড়ি যাওয়ার কোনো যৌক্তিকতাও নেই। তবু যেতেই হবে

আমাকে। আজ ক্ষমা না চাইতে পারলে হয়তো রাতে ঘুমোতে পর্যন্ত পারব না। ছিঃ ছিঃ, কী ভাবল আমাকে সুশান্ত—কত কী ভাবল হয়তো।

আমি ময়ূরকে বললাম, তুমি একটু খবর দিয়ে এসো মুখীকে যে, আমি এ বাড়িতে আছি। দাদাবাবু এলেই যেন খবর দেয় আমাকে—আর দাদাবাবুকে যেন বলে যে আমি এখানে আছি।

ময়ূর বলল, আপনি ভেতরে যান, আমি বলে আসছি।

বাইরের ঘরটায় একটা সোফাসেট, পাটের একরঙা কার্পেট—একটা তেলরঙা ছবি।

বাইরের ঘরে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ভেতরে ঢুকলাম আমি পর্দা সরিয়ে। একফালি বারান্দা—অন্ধকার। বারান্দার ওপারের একটি ঘর থেকে আলোর ফালি এসে বারান্দায় পড়ছিল। ঘরে সবুজরঙা পর্দা ঝুলছে। ঘরের পাখার হাওয়ায় দুলছে পর্দাটা।

আস্তে আস্তে পর্দার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। ভিতরে কোনো শব্দ নেই—শুধু পাখাটার একটানা একটা গুনগুনানি শব্দ ছাড়া। অনেকক্ষণ পর, যেন বহুযুগ পর—কে যেন একটা বইয়ের পাতা ওলটালো—তারপরই সুশান্ত নিজের মনে বলে উঠল, 'The woods are lovely, Silent and deep, Silent and deep, I have miles to go and promises to keep.' কবিতা পড়ছিল সুশান্ত।

ওর গলার সুন্দর আন্তরিক শুদ্ধ উচ্চারণে সেই কথাগুলো আমার সমস্ত কানভরে ঝুমঝুম করে বাজতে লাগল।

কতক্ষণ পর জানি না, অনেকক্ষণ পর আমি বললাম, আসতে পারি?

আমার নিজের কাছেই নিজের গলাটা বড় চোর চোর শোনাল।

সুশান্ত লাফিয়ে উঠে পর্দার দিকে এগিয়ে এল, এসে পর্দা সরিয়ে বলল, আসুন, আসুন। ময়ূর কি ছিল না? এ কি? অন্ধকারে কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়েছিলেন।

—অনেকক্ষণ।

—সে কি! ডাকেননি কেন আমাকে?

—লজ্জা করছিল। বললাম আমি।

—লজ্জা? কীসের লজ্জা আপনার? আচ্ছা এসব কথা পরে হবে, এখন বসুন তো।

বসুন তো বলেই সুশান্ত খুব মুশকিলে পড়ল, কোথায় বসতে দেবে ভেবে না পেয়ে।

ঘরময় একটা সতরঞ্জি পাতা, তার উপর অনেকগুলো ইংরেজি বাংলা বই একসঙ্গে ছড়ানো। একটা তাকিয়া। ঘরের দেওয়ালজোড়া একটা বইয়ের আলমারি—ছোটো একটা ডিভান—তার উপরও বই স্তূপীকৃত করা আছে।

কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে সুশান্ত দৌড়ে গিয়ে কোথা থেকে যেন একটা চামড়ার মোড়া নিয়ে এল, বলল, বসুন তো, বসুন।

তারপর বলল, এ ঘরে তো খুব আপনজন ছাড়া কেউ আসে না, সবাই বাইরের ঘরেই বসে। আপনি যখন এসেই পড়েছেন, তখন বসবার একটা বন্দোবস্ত তো করা উচিত।

আমি বললাম, আমি তাহলে চলে যাই বাইরের ঘরে? আমি তো আপনজন নই আপনার।

সুশান্ত অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল, কোনো কথা বলল না। তারপর নীচু গলায় বলল, বসুন বসুন আমার কী সৌভাগ্য।

অনেকক্ষণ কেউই কোনো কথা বললাম না।

সুশান্ত মুখ নীচু করে বসেছিল।

একটা চাপা পায়জামা আর একটা হালকা বেগুনি পাঞ্জাবি পরেছিল সুশান্ত। চশমাটা নাকে একটু

নেমে গিয়েছিল। ডান হাতে একটা খোলা বইয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ও বসেছিল। কিন্তু ওর মন ছিল অন্য কোথাও। ও কিছু ভাবছিল, যা সে বইয়ের কথা নয়।

পাখাটা গুন্ গুন্ করছিল।

সারা ঘরে আর কোনো আওয়াজ ছিল না।

অনেকক্ষণ পর সুশান্ত মুখ তুলল, মুখ তুলে আমার দিকে ভালো করে তাকাল।

ওর চোখের বিস্ময়ের দৃষ্টিটা আস্তে আস্তে মুগ্ধতায় ভরে গেল, ও যেন নিজের মনেই বলল, বাঃ তোমাকে, সরি, আপনাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তো আজকে, ঠিক যেন...

—ঠিক যেন কী? আমি মুখ তুলে বললাম।

সুশান্ত মুখ নীচু করে বলল, ঠিক যেন করবীফুল। হলুদ করবী। বলেই থেমে গেল।

অনেকক্ষণ পরে বলল, তারপর? হঠাৎ এলেন যে? কী মনে করে?

আমি মুখ নীচু করে বললাম, ক্ষমা চাইতে।

সুশান্ত কোনো জবাব দিল না।

অনেকক্ষণ কোনো জবাব না পাওয়াতে আমি ওর দিকে তাকালাম ভয়ে ভয়ে, লজ্জায়, তাকিয়ে দেখি সুশান্ত হাসছে—এক অদ্ভুত হাসি। এক দারুণ ভালোবাসা, ক্ষমা ও কৌতুকমেশা হাসি ওর মুখময় ছড়িয়ে ছড়িয়ে গিয়ে ওর সমস্ত মুখকে এক দারুণ দীপ্তিতে দীপ্তিমান করেছে।

সুশান্ত বলল, ক্ষমা কীসের জন্যে?

আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি বলে।

—আমার সঙ্গে তো করেননি, আপনার মেজাজ তখন খুব খারাপ ছিল বুঝতে পেরেছিলাম। আমি জানি, রাগটা আমার উপর নয়, ঐ ভদ্রলোকের উপর হয়েছিল। আমি নেহাত উপলক্ষ।

তারপর বলল, ভদ্রলোক কী করেছিলেন? আপনাকে এমন রাগতে আমি তো কখনো দেখিনি।

—ওকে ভদ্রলোক বলবেন না। কোনো ভদ্রলোক এরকম ব্যবহার করেন না। কী করেছিলেন তাও আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না।

—জিজ্ঞেস করছি না। না বললেও অনুমান হয়তো করতে পারছি। ভদ্রলোককে আমি চিনি না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তাঁর উপর আপনি অবিচার করছেন।

আমার রাগ হল, ভীষণ রাগ হয়ে গেল।

বললাম, আপনি কিছুই জানেন না, তাই এরকম মহৎ হওয়ার ভান করছেন। কী করেছিলেন জানলে আপনি এত বড় বড় কথা বলতেন না।

—ওঃ—বলে মুখ তুলল সুশান্ত।

বলল, আমি জানি না উনি কী করেছিলেন, জানতে চাইও না, তবে আমি বলছিলাম যে, কোনো লোকের এক মুহূর্তের কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যবহারই কোনো লোককে সামগ্রিকভাবে বিচার করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারও উপরেই অত সহজ বিশ্বাস হারাতে নেই। মানুষকে, যে-কোনো মানুষকেই বাতিল করার আগে তাকে বিশ্বাস করা উচিত, তাকে বোঝানো উচিত ; তাকে বোঝা উচিত। আমি অবশ্য সেই ভদ্রলোক সম্পর্কে কিছুই জানি না, তবে আমার সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল যে আপনি হয়তো ভদ্রলোককে ভুল বুঝেছিলেন।

—আবারও আপনি ভদ্রলোক ভদ্রলোক করছেন!

—কী করব? বেসিক্যালি আমরা প্রত্যেকেই যে ভদ্রলোক, কখনো-কখনো মাঝে-মধ্যে আমরা অভদ্র হয়ে উঠি, কিন্তু সেজন্যে আমাদের সমগ্র পরিচয়টা তো আর বদলে যায় না ; যেতে পারে না। এই তো আপনি আমাকে আপনার বাড়ি থেকে পত্রপাঠ বের করে দিলেন, আমি তো কারণ

না বুঝতে চেয়ে, আপনি কী ও কীরকম লোক তা না জানতে চেয়ে, আপনার উপর রাগ করে থাকতে পারতাম ; কিন্তু সেটা কি চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া হত না?

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, আপনি জানেন না তাই বলছেন। একজন ভদ্রমহিলাকে একলা পেয়ে, তার স্নেহের সুযোগ নিয়ে যে তাকে অপমান করতে পারে, তাকে ভদ্র বা ভালো বলা কী করে সম্ভব তা তো আমার বুদ্ধিতে কুলোয় না।

সুশান্ত এবার হেসে বইটাকে মুড়ে রাখল, বলল, আমাদের বুদ্ধিতে তো অনেক কিছুই কুলোয় না, আমার অথবা আপনার বুদ্ধিতে কুলোয় না বলেই যে সেটা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় এমন কথা তো নেই। উনি যাই করে থাকুন, আপনাকে অপমান করার জন্যে যে করেছেন তা আপনি বুঝলেন কী করে? আপনি কাজটা, কী কাজ আমি জানি না; খারাপ ভাবতে পারেন, কিন্তু কাজের উদ্দেশ্যটাও যে খারাপ তা জানলেন কী করে?

—জানি। আমরা মেয়ে। আমাদের চোখে কিছুই এড়ায় না। আমাদের সহজাত বুদ্ধিতে পুরুষদের ব্যবহারের উদ্দেশ্য আমাদের চোখ এড়ায় না।

ভুল ভুল; একেবারেই ভুল, বলল সুশান্ত।

তারপর হেসে বলল, পুরুষদের পক্ষ নিয়ে দেখছি আপনার সঙ্গে আমার রীতিমতো ক্রুসেডে নামতে হবে।

বলেই খুব হাসতে লাগল।

আমার আবার রাগ হয়ে গেল, বললাম, আপনি লোকটা মোটেই ভালো নয়, নইলে এরকম একজন লোকের ধামা ধরতেন না।

সুশান্ত আবার হাসল, বলল, ধামা তো ধরিনি। ছেলেটির চেহারা দেখে মনে হল ও একেবারে ছেলেমানুষ—ও কী করেছে আমি জানি না, তবে ওকে আপনি যেমন দাগী আসামী ভাবছেন, ওকে দেখে আমার তেমন মনে হল না। আমরা প্রত্যেকেই, প্রত্যেক মানুষই মানুষ ; আমরা মেশিন নই। তাই আমাদের দু'একটা কৃত বা অকৃত কর্মকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নীচে ফেলে অত বড়ো করে দেখলে আমাদের প্রত্যেকের প্রতিই অবিচার করা হয়। আমার বিশ্বাস, সব লোকই ভালো। ঐ ছেলেটিও ভালো। কেন জানি না, আমার মন কেবলই বলছে যে ওকে আপনি যা ভেবেছেন ও তা নয়।

আমি বললাম, জানি না। হয়তো জানতে চাইও না। তারপর বললাম, ক'টা বেজেছে দেখুন তো আপনার ঘড়িতে। আমার ঘড়িটা তাড়াতাড়িতে ফেলে এসেছি।

সুশান্ত ঘড়ি দেখল, বলল, আটটা। বসুনই না আর একটু। এই তো এলেন। আমার সামনে মোড়ায় বসে আছেন, আমার সমস্ত ঘর দারুণ মিষ্টি গন্ধে ভরে গেছে, আমার ভীষণ ভালো লাগছে। এই অগোছালো ব্যাচেলারের ঘর ছেড়ে আপনি একটু পরে আপনার সাজানো সুখের ঘরে ফিরে যাবেন, অথচ আমার এই ঘরও এক দারুণ সুখে ভরে যাবে। আপনার পারফ্যুমের গন্ধে তখনও ঘর ম' ম' করবে। আপনি চলে যাবার বহুক্ষণ পর পর্যন্ত আমি কল্পনা করব আপনি আমার সামনে বসে আছেন, মনে মনে আপনার সঙ্গে আরও কত ঝগড়া করব দেখবেন।

—ভারী সুন্দর কথা বলেন তো আপনি। আপনার অনেক বান্ধবী আছে, না? তারা সকলেই কি আমার মতো হাঁ করে আপনার কথা শোনেন?

—সকলের সঙ্গে সব কথা বলে সমান আনন্দ হয় না। বান্ধবী হয়তো আছেন, তবে আপনার মতো এমন বান্ধবী কেউ নেই। আপনি আপনিই। ভয় পাবেন না। কিছু চাইব না আপনার কাছে। কিছুই না। তাছাড়া আজ দুপুরেই একজনের যা হেনস্তা দেখলাম চোখের সামনে, তাতে মনের কোণে যদি বা কিছু ভিক্ষা চাওয়ার সাধ জন্মেছিল তা উবে গেছে। বিশ্বাস করুন, আপনাকে শুধু আপনার

জন্যেই আমার ভালো লাগে, বদলে আপনি আমায় কিছু কোনোদিন দেবেন বা দিতে পারেন বলে নয়। কথাটা হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারলাম না, কিন্তু কী করব বলুন, আমার কথার ধরনই এমনি। নিজেই ভালো বুঝি না নিজের কথা, আর আপনি যে বুঝবেন না এতে আশ্চর্য হবার কী আছে।

তারপর সুশান্ত বলল, যাক, বাজে কথা থাক, আপনি কী খাবেন বলুন?

—আপনি কী রান্না করতে পারেন? খাওয়ানোর কথা যে বলছেন? আমি বললাম।

সুশান্তকে ভীষণ বিব্রত দেখাল, মুখটা লাল হয়ে উঠল, বলল, রান্না মানে, একেবারে পারি না তা নয়, পারি। মানে, এই ওমলেট, খিচুড়ি আর মাংস পারি ; সত্যিই, কারও সাহায্য ছাড়াই পারি।

আমি হাসলাম। বললাম, তবে তো অনেক কিছুই পারেন। তাও কারও সাহায্য ছাড়াই যখন পারেন।

ও বলল, আমি একটা স্পেশাল শরবত বানাতে পারি এমন আপনি কোথাওই খাননি, দাঁড়ান বানিয়ে আনছি।

—আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ময়ূরই তো এনে দিতে পারে।

—ময়ূর পারবে না। আমিই আনছি। বলেই সুশান্ত চলে গেল।

আমি একা বসে সুশান্তর ঘরের চারিদিকে চোখ বোলালাম। বইয়ে বইয়ে ঘর ভর্তি। বদলির চাকরি করে! এত বই কী করে যে সব জায়গায় বয়ে বেড়ায় ও-ই জানে। ঘরের এক কোনায় একটা ছোট ইজেল, মাঝে রঙ, তুলি, টার্পেনটাইন তেল, রঙমাখা ছেঁড়া ন্যাকড়া। ইজেলে কোনো কিছু আঁকার মহড়া চলেছে।

সব মিলিয়ে এই ঘরে বসে সুশান্তর মন সম্বন্ধে একটা ধারণা করা চলে। কোনো ঝাঁকড়া গাছের নীচে গরমের দিনে এসে বসলে যেমন লাগে তেমন একটা শান্ত ঠান্ডা ভাব ঘরটায়।

বই রমেনও পড়ে, বেশিরভাগ ক্রাইম থ্রিলার, মারামারি-কাটাকাটির বই, নয়তো অর্ধনগ্ন মেয়ের ছবিসর্বস্ব মলাটওয়ালা ওয়েস্টার্ন পেপারব্যাক। কিন্তু সুশান্ত নানারকম বই পড়ে। সাহিত্যের বই-ই বেশি।

সত্যি কথা বলছি, সুশান্তকে যতই পাশাপাশি দেখছি, আমার পক্ষে রমেনের মধ্যে ভালোলাগার মতো কোনোরকম গুণই খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অথচ আজ থেকে আড়াই বছর আগে এই লোকের মধ্যে আমি কত গুণ দেখেছিলাম—। গুণ আর রূপে কোনো রকম খুঁতই চোখে পড়েনি। শনিবার শনিবার ও আমাকে যখন বাইরে নিয়ে যেত, কোনো ইংরেজি বা হিন্দি ছবি দেখে এসে পার্ক স্ট্রিটের কোনো রেস্তোরাঁতে যখন ও আমাকে নিয়ে খেতে ঢুকত, স্টুয়ার্ডকে ডেকে স্মার্ট ইংরিজিতে খাবারের অর্ডার দিত, অবহেলায়, ক্যাজুয়ালি, দামী সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট ধরাত ঘন ঘন এবং ওর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইনডায়রেকট্‌লি আমাকে এক দারুণ সুন্দর স্বপ্নলোকের আভাস দিত—আমার বেশ লাগত তখন।

তখন ও আমার বড় বাধ্য ছিল। এখন ও জ্ঞানে থাকলে বাধ্যতার ভান করে। সেদিন, মানে বিয়ের আগে আগে ওর এই বাধ্যতা গুণটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু সেদিন আমি বুঝিনি যে বাধ্যতা গুণই পুরুষমানুষের একমাত্র গুণ নয় ; তাহলে যে-কোনো ককারস্ স্প্যানিয়েল কুকুরকে বিয়ে করেই আমার মতো মেয়েদের সুখী হওয়া উচিত ছিল! স্বামীদের মধ্যে আর কিছুই খোঁজার ছিল না।

মা যখন স্নেহের সঙ্গে বলতেন, তুই ভুলে যাস না নীরু, আমাদেরও তোর মতো বয়স ছিল একদিন। আমরাও তোদের অনুভূতি, তোদের বয়স সব পেরিয়ে এসেছি। তুই এত তাড়াতাড়ি মনস্থির

করিস না। আজকে যে জানাকে শেষ বা পরম জানা বলে জানছিস, কাল দেখবি, সেটাই মিথ্যা।

তখন আমার মনে আছে, আমি সদম্ভে মাকে বলতাম, যে, আমি যা জানি তা ঠিকই জানি। তোমরা যা জানতে তা ভুল। আমি, আমরা, আমাদের জেনারেশনের মেয়েরা, তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি জানি ও ঠিক ঠিক জানি।

আসলে আমারই ভুল হয়েছিল। সেদিন যদি বলতাম যে, মা হয়তো আমি আজ যা জানছি তা ভুল, তবুও আমার ভুলের দায়িত্ব আমারই, ঠিকই করি বা ভুলই করি, তার সমস্ত কৃতিত্ব ও অসম্মান আমার একারই প্রাপ্য—সব আমার একারই সামলাবার। আমার ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে তোমরা কেন মাথা ঘামাও?

এ বললেও হয়তো ভালো করতাম।

সেদিন এটুকুও বলিনি মাকে। মাকে শুধুই বলেছিলাম যে তোমরা ব্যাক-ডেটেড ফসিল, তোমাদের সঙ্গে আমাদের মেলে না।

মায়ের ছবির দিকে এখন মাঝে মাঝে চেয়ে সব সে সব কথা ভাবি। একা একা চোখ দিয়ে জল পড়ে!

মা, আমার মাগো, তুমি ঠিকই বলতে মা, আমি তখন ছোটো ছিলাম, আমি আমার নিজের ভালো বুঝিনি, আজ তুমি নেই বলে তাই আমার বাঁচোয়া—। তুমি আজ বেঁচে থাকলে তুমি সবই বুঝতে, সবই জানতে ; আর কেউ নাই-ই বুঝুক, নাই-ই জানুক, কিন্তু তবুও আমি আমার দম্ভ ভেঙে, আমার সবজান্তার মুখোশ খুলে কখনো তোমার কোলে মাথা রেখে কাঁদতে পারতাম না। তোমাকে হয়তো আরও দুঃখ দিতাম, আরও কষ্ট দিতাম, যা বলার নয় সেই সব অন্তঃসারশূন্য সর্বৈব মিথ্যা কথাগুলো পাকা অভিনেত্রীর মতো তোমার নিষ্কম্প চোখে চোখ রেখে বলে আসতাম—বলে এসে—নিজে হাউ মাউ করে কাঁদতাম।

আমরা এই যুগের এই অসংখ্য অল্পবয়সি মেয়েরা কী যেন এক অভিশাপ মাথায় করে জন্মেছি। ক্যাডবারি, আইসক্রিম, সিনেমা, রেস্তোরাঁ, কাররেসিং, ক্লাব, পার্টিতে আমরা যা খুঁজে বেড়াই বিয়ের আগে এবং হয়তো বিয়ের পরও, তা হয়তো আসলে আমরা কেউই চাই না। আসলে আমরা যা চাই তা আমার মায়েরা যা চাইতেন তার চেয়ে পৃথক কিছু নয়। চাই, সত্যিকারের ভালোবাসা।

ভান নয়, ভণ্ডামি নয়, জুয়াচুরি নয়; নিছক অম্লান, দাবিহীন সত্যিকারের ভালোবাসা। একজন সৎ, সুপুরুষ স্বামী, একটি শান্ত ঠান্ডা থাকার জায়গা, এবং একগোছা চাবি। পৃথিবীতে কোনো সুখের আলমারি নেই যে আমাদের সেই চাবির থোকার কোনো না কোনো চাবিতে না খোলে।

কতক্ষণ যে একা একা বসে এতসব ভাবছিলাম জানি না, এমন সময় সুশান্ত ফিরে এল। বলল, সরি, ভীষণ দেরি হয়ে গেল। সেনগুপ্ত সাহেবের বাড়ি যেতে হল তাই দেরি হয়ে গেল!

অবাক হলাম আমি, বললাম, কেন? সেনগুপ্ত সাহেবের বাড়ি কেন?

—ওঁর বাড়িতে লেবুগাছ আছে।

—লেবুগাছ? মানে বুঝলাম না আপনার কথায়।

—মানে লেবু-পাতা আনতে গিয়েছিলাম। আমি যে শরবত বানালাম তাতে লেবু-পাতা অবশ্যই লাগে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত থেকে গ্লাসটা নিলাম। লালচে ও ঘন দেখতে কী এক অদ্ভুত তরল পদার্থ তার মধ্যে শোভা পাচ্ছে। চুমুক দেবার আগে শুধোলাম, বস্তুটি কী?

—আগে খান এক চুমুক, তারপর বলব; বলল সুশান্ত।

এক চুমুক দিয়েই কিন্তু দারুণ লাগল খেতে। টক্ টক্ মিষ্টি মিষ্টি, ঝাল ঝাল।

বললাম, কী দিয়ে বানালেন?

সুশান্ত খুব খুশি হল, আমার ভালো লেগেছে শুনে, তারপর সতরঞ্জিতে বসে পড়ে চোখ মুখ নাচিয়ে বাচ্চা ছেলের মতো বলল, বলব কেন? ট্রেড সিক্রেট্।

—বলুনই না। হেসে বললাম আমি।

—সুশান্ত বলল, আগে বসুন, বলছি।

আমি বসলাম, আপনি নীচে বসে আছেন, আর আমি মোড়ায়, মনে হচ্ছে আমি আপনাকে পড়াচ্ছি। খারাপ লাগছে আমার। নীচে বসি, কেমন?

সুশান্ত তাড়াতাড়ি করে বই সরিয়ে আমার জন্যে জায়গা করে দিল, তারপর বলল, তেঁতুলের রস, শুকনো লংকা পোড়া, একটু নুন, একটু চিনি, আর লেবুপাতা এই-ই তো সব উপাদান। তবে উপাদানেই তো আর সব হয় না, হাতের গুণও চাই; খুব যত্ন করে ভালোবেসে বানাতে হবে। ফ্রিজে বরফ নেই, থাকলে দেখতেন, এর ওপর কয়েকটা আইস-কিউব্স ফেলে দিলে কেমন লাগে।

আমি বললাম, সত্যিই ভারী ভালো খেতে।

সুশান্ত কী বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ময়ূর দৌড়ে এসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দাদাবাবুর খুব অসুখ, ট্যাক্সি করে বাড়িতে নিয়ে এসেছে, শিগগির চলুন।

গ্লাসটা নামিয়ে রেখে আমি উঠে পড়লাম। সুশান্তও লাফিয়ে উঠল, বলল চলুন।

দৌড়ে এসে দেখি, সেন আর মুখী রমেনকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে।

আমরা ঘরে ঢুকতেই হুড় হুড় করে অনেকখানি বমি করে ফেলল রমেন বিছানাতে। ওর কপালে গালে অনেকগুলো কালশিরার দাগ, জামাকাপড় ধুলোমাখা।

রমেন ঘোরের মধ্যে একটি অশ্লীল ইংরিজি গালি দিল।

মুখী ওর কাছে দাঁড়িয়েছিল, বললাম বমিটা পরিষ্কার করে ফেলতে। সুশান্ত চলে গেল, একটু পরেই একটা লাইমজুস কর্ডিয়ালের বোতল নিয়ে ফিরে এল, বলল, জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিন ওঁকে।

সেন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। ওকে শুধোলাম, কী হয়েছিল?

কোনো উত্তর দিল না।

আমি দাঁতে দাঁতে চেপে বললাম, কী হয়েছিল বল?

সেন একবার মুখ তুলে সুশান্তর দিকে তাকাল।

আমি বললাম, এসো পাশের ঘরে এসো, ওঁর কাছে কিছু লুকোবার দরকার নেই, তুমি বলো।

আমরা এসে বসবার ঘরে বসলাম।

সেন বসল না, দাঁড়িয়েই রইল, মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল, বিকেল থেকে রাম খাচ্ছিল রমেনদা, তখনই শরীর খারাপ হয়েছিল, কিন্তু কথা শুনল না, আমি বারণ করাতে আমাকে ঘুষি মারল—বলে হাত দিয়ে ওর কপাল দেখাল, দেখলাম ওর কপালেও কালশিরা পড়ে গেছে।

তারপর বলল, আমার কথা না শুনে আদিবাসী কুলিদের সঙ্গে ওদের বস্তিতে চলে গেল। ওখানে গিয়ে আবার মহুয়া খেল। খাওয়ার পর বুধিয়া বলে একটা রেজা কুলিকে রমেনদা অসম্মান করাতে বস্তির আদিবাসীরা রমেনদাকে ভীষণ মারতে লাগল। আমাকেও মার খেতে হল ওঁর সঙ্গে। ওরা বোধ হয় মারতে মারতে মেরেই ফেলত যদি না ভড়সাহেব খবর পেয়ে কারখানার দারোয়ানদের নিয়ে দৌড়ে না আসতেন।

—ভড়সাহেব কে?

—ভড়সাহেব আমাদের ওয়ার্কস ম্যানেজার। ওঁর স্ত্রী তো আজ সকালেই আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন ওঁর, মনে নেই বউদি? আপনার বান্ধবীর স্বামী।

বললাম, মনে আছে। শেফালির স্বামী।

সুশান্ত এতক্ষণ সোফার কোনায় মুখ নীচু করে বসেছিল। উঠে পড়ে ও আমাদের শোবার ঘরে রমেনের কাছে গেল। গিয়ে কী করল জানি না। মুখী ঘরেই ছিল।

সেন তখনও দাঁড়িয়েছিল। বললাম, বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

আমি চুপ করে বসে রইলাম। শোবার ঘরে আহত মত্ত স্বামী, বাইরের ঘরে আমি, আজ দুপুরেই যে আমাকে অপমান করেছে তার সঙ্গে বসে আমার স্বামীর সম্মানের উপাখ্যান শুনছি তারই মুখে। শুনছিই শুধু; আমার করার তো কিছুই নেই।

অনেকক্ষণ পর হঠাৎ সেন নিজের থেকেই বলল, নীচু গলায়, বউদি আমাকে ক্ষমা করেছেন তো?

আমি মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম সেন তক্ষুনি মুখ নামিয়ে নিল।

সেন আবার বলল, বউদি এখন আপনার মনের অবস্থা কীরকম অনুমান করতে পারছি, এখন ওসব প্রসঙ্গ আলোচনা করব না। পরে সময়মতো কখনো আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে আসব।

তারপরেই হঠাৎ বলে উঠল, আমি ভীষণ কুৎসিত না বউদি? যেমন চেহারা, তেমন স্বভাব। তাই না?

আমি কোনো জবাব দিলাম না। সেনকে বললাম, রমেন হঠাৎ এই গরমে রাম খেতে আরম্ভ করল কেন? তুমিও কি খাচ্ছিলে নাকি?

—আজ যে কারখানার লেবারদের সবাইকে সন্ধের সময় রাম খাওয়ানো হয়েছে। সন্ধের পর নাচও হয়েছিল। রেজা কুলিরা সকলে নাচ-গান করল।

—ওঃ। বললাম, আমি। তারপর শুধোলাম, তুমি খাওনি সেন?

সেন বলল, আমি তো ওসব খাই না বউদি।

কথাটা বিশ্বাস হল না আমার, বললাম, সেকি? ভারী আশ্চর্যের কথা তো? একা থাকো, কারখানায় কাজ করো, এত স্বাধীনতা, এত রোজগার; আর ড্রিঙ্ক করো না? আজকাল এসব কথা ভাবলেও অবাক লাগে যে!

সেন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

আমার কথায় যে বিদ্রূপ ও শ্লেষের ঝাঁঝ ছিল, তা বোধহয় হজম করছিল ও, হজম করতে সময় লাগল, তারপর সেন এক সময় মুখ তুলে বলল, করি না বউদি। সত্যিই করি না, কারণ এর মধ্যে বাহাদুরি করার মতো কিছু আছে বলে মনে হয় না আমার। তাছাড়া আমার মাইনেতে কলকাতায় আমাদের সংসার চলে। আমার বিধবা মা ও আমার ছোট দু ভাইবোন আমার মুখ চেয়ে সারামাস বসে থাকেন। যা রোজগার করি তার চেয়ে বেশি রোজগার করলে, নিজের খুশিমতো খরচ করার মতো পয়সা থাকলে কী করতাম জানি না, তবে এখন এসব করতে গেলে চুরি করতে হয়। চুরি করতে পারি না বলেই, হয়তো পারি না।

সেনের গলার স্বরে কোনোরকম ঔদ্ধত্য বা বাহাদুরি ছিল না, বরং বিনয় ছিল।

ওর কথা শেষ হতেই ওর দিকে তাকালাম। স্ট্যান্ড লাইট ছাড়াও উপরের বড় বাতিটাও জ্বলছিল, দেখলাম সেনের কালো কুৎসিত মুখটার মধ্যে ওর চোখ দুটো অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং সরল। কেন জানি না সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, হয়তো সুশান্ত একটু আগে যা বলছিল, তা ঠিক।

সেন বলল, বউদি, রমেনদা এরকম করলে কিন্তু রমেনদার চাকরি বেশিদিন থাকবে না। এ বাজারে

চাকরি গেলে নতুন চাকরি পাওয়া কিন্তু সত্যিই মুশকিল। তাছাড়া জানেনই তো, আমাদের মতো মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়র এখন ছড়াছড়ি যাচ্ছে দেশে। আপনি রমেনদাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন।

আমি বললাম, ব্যাপারটা আমার নয়, আর যাকে বলব সে-ও শিশু নয়, তাই এসব কথা আমাকে বোলো না।

একটু পরে সেন আবার বলল, আমি কি রাতে থাকব? আমার কি দরকার হবে?

—না। না। কোনো দরকার নেই। কীসের দরকার?

আমার বলার ধরনে সেন লজ্জা পেল, আমিও ওরকমভাবে কথাটা বলে ফেলে লজ্জিত হলাম।

আজ দুপুরের ঘটনাটা মন থেকে চট করে মুছে ফেলা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে।

সুশান্ত যে ওঘরে এতক্ষণ ধরে কী করছে, ও-ই জানে।

সেন উঠে পড়ল হঠাৎ, বলল, রমেনদাকে বলে আসি।

ও ঘর থেকে ফিরে এসে সেন বলল, চলি, রমেনদা ঘুমোচ্ছেন; কাল সকালে এসে খোঁজ নিয়ে যাব।

সিঁড়ির কাছে এসে মুখ ঘুরিয়ে ও আবার বলল, চলি বউদি!

আমি বললাম, দাঁড়াও—বলে আরও কাছে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, তুমি দুপুরে ওরকম করলে কেন?

সেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল।

ঘরের মধ্যেও এতক্ষণ যে বসেছিল আলোয়, তাতেই মনে হচ্ছিল এত আলোয় বসে থাকতে বুঝি ওর খুব অসুবিধা হচ্ছে, ও যেন কোনো অন্ধকার কোণের আশ্রয় খুঁজছে। এমন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ও যেন একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। তারপর আস্তে আস্তে মুখ নীচু করে বলল, আমি জানি না বউদি। তখন থেকে আমিও কেবলি সে কথাই ভাবছি; কেন এমন করলাম? সত্যিই জানি না।

—শোনো! আমি ডাকলাম ওকে।

ও আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল।

বললাম, তুমি আর কোনোদিন আমাদের বাড়ি এসো না; কোনোদিনও না।

বলেই, সম্পূর্ণ বিনা কারণে শব্দ করে দরজাটাকে ওর মুখের ওপর বন্ধ করে দিলাম।

সেনের মোটর সাইকেল ছিল না; ও রমেনকে নিয়ে ট্যাক্সি করে এসেছিল। ও নিশ্চয়ই হেঁটে হেঁটে কালীবাড়ির ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিল। আমি জানি ও মাটির সঙ্গে মিশে কোনো পোকার মতো হীনমন্য পদক্ষেপে হেঁটে যাচ্ছিল, ওকে আমি যদি শংকর মাছের চাবুক দিয়ে চাবকাতাম তবেও বোধহয় ও এত আঘাত পেত না।

কিন্তু আমার কিছু করার নেই। অন্তত এই মুহূর্তে আমার মনে হয় যে আমার কিছুই করার নেই ওর জন্যে।

ওঘরে গিয়ে দেখি, সুশান্ত মুখীকে দিয়ে বিছানার চাদর বদলেছে। ও ওডিকোলনের পটি লাগিয়েছে রমেনের মাথায়, বড় আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ছোটো টেবল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। সুশান্ত রমেনের মাথার কাছে বসে ওর গায়ে হাত বুলোচ্ছে; রমেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি গিয়ে রমেনের পাশে দাঁড়ালাম। সুশান্ত দাঁড়াল, তারপর বসে পড়ে বলল, আমি এখানে বসছি; আপনি খেয়ে আসুন।

—আমার খেতে ইচ্ছা করছে না। আমি বললাম।

সুশান্ত দৃঢ় গলায় বলল, ইচ্ছে না করলেও, অনেক কিছু করতে হয়। যান, খেয়ে আসুন।

সুশান্তর গলার স্বর শুনে আমার অবাক লাগল, ও যেন আমাকে আদেশ করছে। আমার ও কে যে ও আমাকে আদেশ করে?

আমি বললাম, আমি খাব না।

আপনি খাবেন। যান বলছি, খেয়ে নিন। জোর দিয়ে বলল সুশান্ত।

তারপর বলল, আপনি বড় জেদী। এই জেদের জন্যে জীবনে আপনি অনেক কষ্ট পাবেন। মেয়েদের এত জেদ ভালো নয়।

আমার রাগ হয়ে গেল। বললাম, আপনি পিসিমার মতো কথা বলবেন না তো। আমি কষ্ট পাচ্ছি, কী পাব তা আমার ব্যাপার। আপনার মাথা ঘামাতে হবে না! আপনি বাড়ি যান।

সুশান্ত আমার মুখের দিকে চাইল, তারপর বলল, বেশ। আমি যাচ্ছি। রাতে কোনো রকম দরকার হলে আমাকে ডাকবেন।

মুখ ফিরিয়ে আমি বললাম, ডাকব; যদি দরকার হয়। হয়তো দরকার হবে না।

আমার দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকাল সুশান্ত, তারপর বলল, চলি নমস্কার।

আমার অবাক লাগল। ও কোনোদিনও আমার সঙ্গে এমন ফর্ম্যালিটি করেনি। আমার ধারণা ছিল এসব সামাজিক ফর্ম্যালিটি ওর আসে না। জানি না, কেন আজ ও হঠাৎ এমন ফর্মাল হয়ে উঠল।

আমি উঠে ওঘর অবধি গেলাম না।

মুখী গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

মুখীকে বললাম, খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়তে।

তারপর একটা বই নিয়ে এসে ইজিচেয়ারে শুলাম। কেন জানি না, রমেনের পাশে শুতে আমার ঘেন্না করছিল। আমার প্রেমিক, আমার আদরের রমেন, আমার অবলম্বন, আমার ভবিষ্যৎ, আমার সোনা, আমার সর্বস্ব; আমার স্বামীর পাশে শুতে আমার ঘেন্না করছিল।

মাঝরাতে হঠাৎ কতকগুলো কুকুরের চিৎকার শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকায় কাঁধে একটা ব্যথা হয়েছিল। উঠে একবার রমেনের কাছে গেলাম।

ও তেমনি ঘুমোচ্ছে। Sleeping it off—খোঁচা খোঁচা দাড়ি; নাকের ফুটো থেকে কয়েকটা লোম বেরিয়ে আছে, দেখলে আমার ঘেন্না লাগে, চোখে-মুখে মারের দাগ, মুখে এখনও ভক্ ভক্ করছে গন্ধ, চুলগুলো লেপ্‌টে আছে কপালে। আমার বয় ফ্রেন্ড, আমার ইহকাল-পরকালের ভরসা, আমার সম্মান ও প্রেমের পাত্র, আমার প্রিয় রমেন, মাতাল হয়ে শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে আছে।

জানালার কাছে সরে গেলাম।

ইউক্যালিপটাস গাছের পাতায় পাতায় জ্যোৎস্না ঠিকরে যাচ্ছে। টিস্‌কোর কারখানার ব্লোয়িং হচ্ছে ; আকাশের চাঁদের রুপোকে ম্লান করে তার রক্তিমাভা থৈ থৈ করছে। কী একটা রাতচরা পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল জানালার পাশ দিয়ে।

চারদিক নিস্তব্ধ। প্রত্যেক বাংলোয় প্রত্যেকে শান্তির ঘুম ঘুমোচ্ছে। আমি একা মাঝরাতের জানলায় দাঁড়িয়ে ভাবছি আমি কী করব। বাবার শরীরটা ভালো না; বাবাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে।

এতক্ষণ আমি একটা দারুণ মিষ্টি স্বপ্ন দেখছিলাম। ভাবছিলাম জীবনে সবকিছু করারই একটা রকম আছে, রুচি আছে। এই রুচিভেদই একজন মানুষের সঙ্গে অন্য একজন মানুষের পৃথকীকরণের উপায়।

স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমার স্বামী কারখানা থেকে ফিরল রাত করে। আমি বসবার ঘরে এসে

উল বুনছিলাম। আমরা ঠিক করেছি, আগামী মাসে আমি কনসিভ করব। স্বামীর বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, ও বলেছিল, চাকরিতে আর একটু উন্নতি হোক, একটা গাড়ি কিনি; তারপর।

আমি বলেছিলাম যে না, তা নয়। সময়মতো ছেলে-মেয়ে না হলে তাদের মানুষ করা মুশকিল। ও রাজি হয়েছিল। তাই এখন থেকে আমি আগন্তুকের জন্যে তৈরি হচ্ছি। আমার ইচ্ছা দারুণ একটা দুরন্ত ছেলে হবে, ঘরময় হুটোপাটি করে বেড়াবে, এটা ভাঙবে, ওটা ভাঙবে, চেঁচামেচি করবে; ওর মতো লম্বা-চওড়া হ্যান্ডসাম হবে।

ছেলেরা বেশি ফর্সা হলে ভালো লাগে না, গায়ের রঙ ওর মতো হবে ; মুখটা যেন আমার মতো হয়।

ও এসে জামাকাপড় খুলেই সোজা বাথরুমে গেল। ওর পায়জামা-পাঞ্জাবি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। পায়জামা-পাঞ্জাবি দিয়ে বাথরুমের দরজায় টোকা দিতেই, দরজা খুলেই সাবান-মাখা মুখে ও আমায় আদর করে দিল।

অসভ্য কোথাকার! বলে, আমি ওগুলো এগিয়ে দিয়ে পালিয়ে এলাম।

চান-টান করে ও এসে বসবার ঘরে বসল।

পায়জামা-পাঞ্জাবি পরলে ওকে খুব ভালো দেখি আমি। ও বলল, বুঝলে নীরু, আজ একটা ভালো খবর আছে।

—কী খবর? বললাম আমি, উলের কাঁটা থেকে চোখ না তুলে।

—চোখ তোলো, না হলে বলব না।

—বলো না বাবা, বলে আমি তাকালাম ওর দিকে।

—তোমার শোওয়ার ঘরে এয়ার-কন্ডিশনার লাগছে পরের সপ্তাহে।

—আমার ভীষণ আনন্দ হল, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে বললাম, বাজে কথা বোলো না।

—বাজে কথা নয় ম্যাডাম। আজকে এম.ডি. ডেকেছিলেন, বললেন, আমার কাজে উনি খুবই সন্তুষ্ট। এই গরমে মিসেস ঘোষের খুবই অসুবিধা হয় নিশ্চয়ই, তাছাড়া আমি চাই যে আমাদের কোম্পানির সকলে ভালোভাবে থাকুন। তাই আমি বলে দিয়েছি, মেনটেনেন্স ডিপার্টমেন্টকে যে, পরের সপ্তাহে আপনার বেডরুমে একটা এয়ার-কন্ডিশনার লাগিয়ে দিয়ে আসবে।

—সত্যি! আমি বললাম।

—সত্যি ম্যাডাম, সত্যি। আমাদের কোম্পানিটা খুব ভালো। এম.ডি.-র মতো তো লোক হয় না। আমাদের কোম্পানির প্রতিটি লেবার খুশি। ইউনিয়ন-ফিউনিয়নের বালাই নেই—ছ'মাসের বোনাস পায় প্রত্যেকে, তাছাড়া কারও কোনো অসুবিধাই নেই।

—বাঃ! খুব ভালো।

—খুশি তো, তুমি?

আমি হেসে বললাম, খু-ব-উব। তারপর বললাম, তুমি দেখো, তোমার আরও উন্নতি হবে। তুমি কত ভালো তা তুমি জানো না। তাছাড়া তোমার জন্যে আমি যে সবসময় কত বলি!

—কাকে বল? আমার স্বামী দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল।

—যাকে বলার, সেই একজনকে। তুমি তো বিশ্বাস করো না; আমি করি। তুমি বড় হও গো জীবনে; শুধু টাকায় নয়, সব দিক দিয়ে, তোমার জন্যে যেন আমি গর্বিত হতে পারি। আমার বাড়ির আত্মীয়স্বজন একদিন কত কী বলেছিল, আমি ঠকেছি, বলেছিল নিজের পায়ে আমি নিজে কুড়ুল মারছি। আমি একদিন দেখিয়ে দেব যে আমি যা করেছিলাম, তা ঠিক; তোমরা ভুল। তোমাকে অনেক বড় হতে হবে। হবেও তুমি; তুমি দেখো। একদিন লোকে বলবে, এরকম ব্রিলিয়ান্ট ইঞ্জিনিয়র

দেশে নেই, এরকম ভালো লোক হয় না; এরকম সৎ লোক হয় না।

ও হাসল, বলল, তুমি কিন্তু যতখানি আছ, তার চেয়ে বেশি ভালো বা বেশি সুন্দরী হয়ো না।

আমি হাসলাম, বললাম, কেন?

—বাঃ তাহলে তোমাকে হারাবার ভয় থাকবে সবসময়। এমনিতেই তোমাকে আমার এ ঘরে মানায় না; আমার জীবনে তুমি হলে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। যা হয়েছে এবং যা হবে সবই তো তোমার জন্যে, তোমার শুভকামনায়, বলো, কী চাকরি করতাম কলকাতায়, আর এখন কী করছি।

—জানো, আমার বিশ্বাস, ভালো করলে ভালো হয়। কখনো ফাঁকি দিও না, কাজে ফাঁকি দিও না, অন্যকেও না, দেখবে, ভালো একদিন হবেই। সফলতা বা বিফলতা; সব ব্যাপারেই তার পেছনে কারণ থাকেই।

ও হাসল, বলল, মেয়েদের পড়িয়ে পড়িয়ে তোমার একেবারে দিদিমণি দিদিমণি ভাব হয়ে গেছে। এমন চোখ বড় বড় করে বলো না।

—আমি হেসে বললাম, ইয়ার্কি কোরো না।

একটু পরে ও বলল, আজ বড় খাটুনি গেছে। গরমটাও কমবে না। জুন মাসের মাঝামাঝি, অথচ বৃষ্টির দেখা নেই।

—সত্যি, তাছাড়া তোমাদের কারখানায় যা গরম, শরীরের রক্ত শুষে নেয়। একটা বিয়ার খাও না। সেদিন দাশগুপ্ত সাহেব বলেছিলেন যে কারখানা থেকে আসার পর গরমের দিনে একটা করে বিয়ার খাওয়া খুব ভালো।

—তা ভালো, কিন্তু রোজ বিয়ার খেতে গেলে কত টাকা লাগে? এখনও অত সব অ্যাফোর্ড করতে পারি না। তাছাড়া তুমি আবার গুণ্ডা ছেলের মা হবে—টাকা-পয়সা জমাতে হবে তো?

—আহা? অসভ্য! মাঝে মাঝে খেও। রোজ খেতে হবে না। তাছাড়া আমি কী রোজগার করি না? আমিই তোমাকে খাওয়াব। বলে, মুখীকে দিয়ে তার বরের হাতে চিঠি দিয়ে টাকা দিয়ে পাঠালাম। সে সাইকেল নিয়ে গিয়ে ওর জন্য কোল্ড-বিয়ার নিয়ে এল।

আমার সামনে বসে, গল্প করতে করতে বিয়ার শেষ করে উঠল ও।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা শুতে গেলাম।

ওর ভীষণ শখ, আমি যেন নাইটি পরে শুই। আমার ভালো লাগে না। কেন, জানি না। বিয়ের আগে তো কখনো পারিনি। আসার আগে নিউ-মার্কেট থেকে একটা নাইলনের নাইটি কিনে নিয়ে এসেছিল ও। ও বলে নাইটির উপর দিয়ে আমার গা ছুঁতে ওর নাকি দারুণ লাগে, ওর নাকি মনে হয় ও অ্যারাবিয়ান নাইটসের যুগে চলে গেছে।

ও এঞ্জিনিয়র হলে কী হয়, ও খুব রোমান্টিক। ও জানে মেয়েদের কী করে ভালোবাসতে হয়, কী করে আদর করতে হয়। ওর চরিত্রে কোথাও কোনো স্থূলতা নেই। আমার সঙ্গে ওর ব্যবহার আমার কাছে আলি আকবরের বাজনার মতো মনে হয়। ওর সবল হাতে মাথা রেখে শুয়ে থাকতে আমার দারুণ ভালো লাগে। জানতে ভালো লাগে যে, আমি কত বুদ্ধিমতী, নিজের মতানুযায়ী আমি কী দারুণ একজনকে বিয়ে করেছি ; জীবনের সঙ্গী নির্বাচনে আমার ভুল হয়নি কোনো। ওর ব্যবহারে, ওর চেহারায়, ওর বিনয়ে, আমাদের পরিবারের সকলে মুগ্ধ। ওর একমাত্র খুঁত ছিল এই যে, ওর প্রথম স্ত্রী ওকে ডিভোর্স করেছে। ওকে দেখে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, সে নিশ্চয়ই কোনো হতভাগিনী। যে মেয়ে এমন ছেলের সঙ্গে ঘর করতে না পারে, সে কারও ঘর করারই যোগ্য নয়।

কতক্ষণ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। ভোর হয়ে এল। মালহোত্রা সাহেবের বাড়ির মুরগিগুলো ডাকতে আরম্ভ করল। গুপ্ত সাহেবের বাড়ির গোয়ালা চেঁয়াক্ চোঁয়াক্ আওয়াজ করে গোরু দুইতে আরম্ভ করল।

আমি রমেনের কাছে এলাম।

ডান পা-টা বুকের কাছে গুটিয়ে শুয়ে আছে রমেন।

পায়জামাটা হাঁটুর অনেকখানি উপরে উঠে গেছে। অসভ্যর মতো দেখাচ্ছে।

ওর দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম যে, আমি অনেকদিন ভাবার বা বোঝার চেষ্টা করেছি ও কেন এমন করে।

অনেক সময় অনেক পুরুষমানুষ এমন করে যাদের কোনো গভীর দুঃখ আছে, যে দুঃখকে তারা ভোলার জন্যে এমন করে নিজেদের নষ্ট করে। কারও বা কোনো অভিযোগ থাকে জীবন সম্বন্ধে—যে অভিযোগের কোনো প্রতিকার নেই। সমস্ত দিক থেকে আমি রমেনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি, যাতে ওকে খারাপ ভাবার আগে ওর প্রতি আমি যথেষ্ট সুবিচার করি। আমার কাছে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই।

মনে হয় যারা দাগী চোর, তারা বোধহয় কিছুদিন বাদে কোনো কারণ ছাড়াই চুরি করে, চুরি করার আনন্দেও চুরি করে, খুনী যেমন রক্তের নেশায় খুন করে, রমেনও বোধহয় তেমনি কোনো অজ্ঞাত কারণেই এরকম করে।

বিয়ের আগে ও আমার কাছে যে রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যে সব ভূরিভূরি মিথ্যাকথা বলে আমাকে ভুলিয়েছিল, তা বোধহয় শুধুই আমার শরীর এবং আমার পরিবারের সঙ্গে জড়িত হয়ে নিজের নামগোত্রহীন পরিচয়কে উন্নত করার জন্যে।

জানি না। জেনে এখন লাভও নেই কোনো। ভগবানকে সাক্ষী রেখে বলতে পারি যে, আমার দিক থেকে কোনোরকম ত্রুটি হয়নি। আমার কোনো দোষ নেই ওর খারাপ হবার জন্যে। ও কেন যে এমন ঠগীর মতো ব্যবহার করল আমার সঙ্গে তা ও-ই জানে।

আমার লজ্জা নানা কারণে। এই লোকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্যে ধার করে, কত কষ্ট স্বীকার করে বাবা ও দাদা-দিদিরা আমার জাঁকজমক করে বিয়ে দিয়েছিলেন। এ তো শুধু আমার একার সর্বনাশ নয়; আমার জেদের জন্যে কতজন নিরপরাধ লোকের কত ক্ষতি। এই লজ্জা আমার রাখার জায়গা নেই। এ অপমান আমার একারই সইতে হবে।

যে আশ্রয় ত্যাগ করে, নিজে মাথা উঁচু করে একদিন রমেনের হাত ধরে সানাইয়ের সুরের মধ্যে, ফুলের গন্ধের মধ্যে, অগণিত বন্ধুবান্ধব ও দাদা-দিদিদের অশ্রুসিক্ত চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম, সেই আশ্রয়ে ফিরে গিয়ে মাথা নিচু করে আমি কোনোদিনও বলতে পারব না যে, আমারই ভুল হয়েছিল। তোমরাই ঠিক।

মাঝে মাঝেই আমার বিয়ের দিনটার কথা মনে পড়ে। আমার জীবনে এত সুন্দর, এত বড়, অথচ এতখানি ব্যর্থ আর কোনো উৎসব আর কোনোদিনও উদ্‌যাপিত হবে না।

মনে মনে আমি আজকাল বাবার মৃত্যুকামনা করি। বাবা বেঁচে থাকতে যেন বাবা কোনোদিনও জানতে না পান যে তাঁর সবচেয়ে আদরের মেয়ের আজ এই অবস্থা।

রমেন চোখ খুলল।

বললাম, কেমন আছ?

রমেন হাসল। অনুশোচনার হাসি নয়। বাহাদুরির হাসিও নয়। জেমস্ বন্ডের ছবির ভিলেনরা যেমন হাসে তেমন হাসি। এ হাসির কোনো মানে হয় না।

ও বলল, মুখী কোথায়? চা দিতে বলো।

মুখীকে চা করতে বললাম। আজ আমার স্কুল আছে, চা খেয়ে চান করতে যাব।

তারপর ঘরে এসে বললাম, চান করবে না? কারখানায় যাবে না আজ?

—তোমার অত মাথাব্যথা কীসের? আমাকে তো তাড়ালেই তুমি খুশি হও।

—মানে?

—কোনো মানে নেই।

—বললাম, সেন বলছিল, তোমাদের ওয়ার্কস ম্যানেজার না গিয়ে পড়লে নাকি তোমাকে মেরেই ফেলত।

—মেরে ফেলা কী এতই সহজ? আমি হচ্ছি অক্ষয়; অমর। তবে তোমার বান্ধবীর বরই সময়মতো বাঁচিয়ে দিয়েছে। সে কথা সত্যি।

আমার হঠাৎ শেফালির কথা মনে পড়ে গেল। শেফালির বর বাড়ি ফিরে নিশ্চয়ই শেফালিকে সব কথা বলেছে।

আমি মুখ নীচু করে রইলাম। তারপর বললাম, এরকম করলে চাকরিটা কি থাকবে?

—না থাকলে, থাকবে না। আমার কোয়ালিফিকেশান আছে, আমার মতো স্মার্ট সেলস্ম্যান পাবে ওরা? চাকরি গেলে আবার অন্য চাকরি নেব। আমাকে তো তুমি মনে করো যে আমি একটা কিছুই না। আমার এলেম আর বুঝল কে?

বললাম, আর কেউ না বুঝুক, আমি অন্তত বুঝেছি।

রমেন আমার দিকে আগুনের চোখে তাকাল। তারপর বলল, কাল পাড়ার লোক জড়ো করেছিলে কেন? ঐ সুশান্ত বোসকে সব ব্যাপারে ডাকার দরকার কী? আমি মার খেয়েছি, কী নেশা করেছি সেটা আমার তোমার ঘরোয়া ব্যাপার—তাতে বাইরের লোককে ডাকার দরকার ছিল কি কোনো?

—ব্যাপারটা আর ঘরোয়া রইল কোথায়? বললাম আমি।

—রাখা উচিত ছিল।

—সেটা যাতে থাকে, তা ভবিষ্যতে তুমি মনে রেখো। এরকম ব্যাপার যাতে না ঘটে, তা দেখো।

আর কথা না বলে আমি চান করতে গেলাম।

মুখীকে বললাম, আমি খাব না, দাদাবাবু খাবেন কী না জিজ্ঞেস করে রান্না করিস। কারখানায় না গেলে হয়তো খাবেন।

আমার কোথাও যাবার ছিল না, স্কুলের তখনও অনেক দেরি, তবু সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম। *কিছুক্ষণ সকালের পথে একা একা হাঁটা দরকার। রাতে ঘুম হয়নি, মাথাটা বড় ধরে আছে। কাল সারাদিন খাইনি।*

বাড়ি ছেড়ে এগিয়েছি, পথে ডাকপিয়নের সঙ্গে দেখা। বলল, চিঠি আছে। চিঠিটা রমেনের নামে। হাতের লেখাটা চেনা লাগতে নিয়ে নিলাম। দেখলাম মেজকাকার লেখা চিঠি।

মেজকাকা হঠাৎ রমেনকে কেন চিঠি লিখতে গেলেন ভেবে পেলাম না। চিঠিটা হাঁটতে হাঁটতে *খুললাম। ভীষণ কৌতূহল হল।*

ভবানীপুর
কলিকাতা

কল্যাণীয় বাবা রমেন,

আশাকরি তোমরা দুজনে ভালো আছো। জামশেদপুরে আসার সময় তুমি ব্যবসা করবে বলে যে আড়াই হাজার টাকা ধার হিসেবে নিয়েছিলে তা আজও শোধ দাওনি। তুমি বলেছিলে যে তোমার চাকরির রোজগারের উপর আরও কিছু রোজগার হলে নীরু খুশি হবে। নীরু আমাদের সকলেরই স্নেহের পাত্র। তার সুখের জন্যে তোমাকে ঐ টাকা তখন জোগাড় করে দিই। কথা ছিল, তুমি তিনমাসের পরই মাসে মাসে পাঁচশো করে দিয়ে টাকাটা শোধ দিয়ে দেবে। কোনোরকম সুদ দিতে হবে না, তাও তোমাকে বলেছিলাম।

আজ দেড়বছর হয়ে গেল, এ পর্যন্ত তুমি টাকাটা পাঠালে না, এবং আমাকে এ সম্বন্ধে কিছু জানালেও না। তোমার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক, তাতে টাকার তাগাদা করে চিঠি লেখা আমার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাকর। কিন্তু আমার ছোটো মেয়ে মণির বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। টাকাটা আমার অত্যন্ত দরকার। বুঝতেই পারছ, খুব দরকার না থাকলে এ চিঠি তোমাকে লিখতাম না।

সেরকম অবস্থা থাকলে টাকাটা তোমাকে এমনিই দিয়ে দিতে পারলেই আমি সুখী হতাম, কিন্তু সেরকম অবস্থা আমার নয়; তা তুমি জানো।

এ চিঠি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে লিখছি। যদি আমার নীরু মা এ কথা জানে, তবে সে বড় লজ্জা পাবে। আমি তাকে ভালো করেই জানি—তার মতো আত্মসম্মানজ্ঞানী মেয়ে বড় একটা দেখিনি। আমার অনুরোধ, অন্তত তার সম্মানার্থে এ টাকাটা তুমি পাঠাবার চেষ্টা করবে জুলাই মাসের মধ্যে। ইতি—

আশীর্বাদক
হরিচরণ চৌধুরি।

শ্রীরমেন ঘোষ, কল্যাণীয়েষু
কদমা, জামশেদপুর

আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল।

মনে হল পা বুঝি আর চলবে না।

কী করব ভেবে পেলাম না। স্কুলে যাওয়া আমার হল না। এ অবস্থায়, এমন মন নিয়ে কিছু করা চলে না। মেয়েদের পড়ানোর মতো মনের অবস্থা আমার নেই। এখনও স্কুল খোলেনি, খুললে কোথাও থেকে ফোন করে দেব মিসেস প্রধানকে, আজ ক্যাজুয়াল লিভ নেব।

মনস্থ করলাম বাড়িই যাব। কোনোদিন রমেনের সঙ্গে ঝগড়া বলতে যা বোঝায় তা করিনি আমি, আমার খুব গলা ছেড়ে আজ ঝগড়া করতে ইচ্ছে হল। একদিন আমার মনে হত যে যতটুকু কষ্ট বা অপমান তা আমার একারই; আমার জন্যে যে আমার পরিবারের অন্য কেউ এমনভাবে জড়িয়ে পড়বে তা ভাবতে পারিনি।

মেজকাকার অবস্থা কী আমি জানি। তাঁর একমাত্র অপবাধ যে উনি আমাকে ভীষণ ভালোবাসেন। সে কথা রমেন জানত। রমেন যদি মেজকাকার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে আসতে পারে, তাহলে হয়তো অন্য অনেকের কাছ থেকেই নিয়েছে। যা আমি গোপন করে রাখতে চাইছিলাম এতদিন, আমার সম্মানের জন্যে, তা বুঝি অনেক আগেই সকলের কাছে ফাঁস হয়ে গেছে। সকলে জেনে গেছে আমি কতবড় একজন জোচ্চোরকে বিয়ে করেছি। সত্যি সত্যি, আমার এখন কী করণীয় তা আমি জানি না।

বাড়ির পথে আসতে আসতে সুশান্তর বাড়ির সামনে এসে কালকের মতো থমকে দাঁড়ালাম।

সুশান্ত অফিসে কাজ করে, কারখানায় নয়; তাই সকাল সাড়ে ন'টার আগে ও বেরোয় না বাড়ি থেকে।

ময়ূর এসে দরজা খুলল, বলল, দাদাবাবু এখনও ঘুম থেকে ওঠেননি।

বললাম, সে কী? দাদাবাবুকে তোলো, বলো আমি এসেছি।

ময়ূর বলল, বউদি, আমি একটু বাজারে যাচ্ছি, একদৌড়ে যাব আর আসব। আপনি গিয়ে তুলে দিন দাদাবাবুকে। দরজা খোলা আছে। কাল দাদাবাবু খাননি রাতে, শোওয়ার ঘরেও যাননি। ঐ ঘরেই বইপত্রের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন বই পড়তে-পড়তে।

আমি যখন দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম সে ঘরে, সুশান্ত তখনও বাচ্চা ছেলের মতো সতরঞ্জির উপর শুয়েছিল।

আমি ডাকতে পারলাম না, বুঝলাম না, কী বলে ডাকব ওকে।

ঘুমের মধ্যে ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। ও নিজেই একবার পাশ ফিরল, তারপর হঠাৎ উঠে বসল। উঠে বসেই মাথার পাশে রাখা হাতঘড়িটা তুলে নিয়ে দেখে বলল, ঈস্‌স্‌...।

বলেই, যেই দরজার দিকে চাইল, দেখতে পেল আমাকে।

আমাকে ঐ সকালে দেখে অবাক হল সুশান্ত। বলল, রমেনবাবু ভালো আছেন তো?

আমি বললাম, ভালোই আছেন।

—তবে?

—আপনি ভালো আছেন কী না তাই দেখতে এলাম।

—ও। বলল সুশান্ত। পরক্ষণেই বলল, আপনি বসবার ঘরে বসুন, আমি মুখ-চোখ ধুয়ে আসি।

আজ বসবার ঘরে বসতে বলায় আমার মনের কোণে কোথায় যেন কী একটা বাজল। কালকে যে আপনজনের মতো আদর করে আমাকে ভিতরের ঘরে বসিয়েছিল, আজ সেই-ই আমাকে বাইরের ঘরে গিয়ে বসতে বলল।

একটু পরে সুশান্ত ট্রেতে বসিয়ে চায়ের পট, দুধ, চিনি এবং কয়েকখানা ক্রিমক্র্যাকার বিস্কিট নিয়ে এল। বলল, চা খান। আমার অফিসের আজ ভীষণ দেরি হয়ে যাবে। কাল পড়তে পড়তে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল।

বললাম, কাল খাননি কেন?

সুশান্ত চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে বলল, আপনাকে কে বলল? ময়ূর বুঝি?

—হ্যাঁ।

—এমনিই খাইনি, কোনো কারণ নেই।

বলেই মুখ ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল।

অনেকক্ষণ সুশান্ত কোনো কথা বলল না।

কী বলব, আমিও ভেবে পেলাম না।

বলতে ইচ্ছে করল আমার, সুশান্ত, তুমিই এখানে আমার একমাত্র বন্ধু, তোমার কাছে আমার অনেক কিছু বলার ছিল, ছিল অনেক কিছু পরামর্শ করার, তুমি ছাড়া আমার কেউই নেই যে এই মুহূর্তে আমাকে বলতে পারে, কী আমার করা উচিত। তুমি আমাকে পথ বলে দাও সুশান্ত। আমি একজন সাধারণ মেয়ে, আমি এক সাংঘাতিক ভুল করেছি জীবনে, এর চেয়ে বড় ভুল আর হয় না। তুমি আমাকে এই মুহূর্তে ফিরিয়ে দিও না, চলে যেতে বোলো না। তোমার সঙ্গে আমি খারাপ ব্যবহার করেছি, কেন করেছি তা তুমি জানো; সব জেনেও তুমি আমাকে ফিরিও না। এমন করে, আমার এই অসহায়তায় আমাকে দূরে ঠেলো না।

একটু পরে ময়ূর এল বাজারের থলে নিয়ে।

সুশান্ত আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, তাড়াতাড়ি রান্না কর ময়ূর—আমার অফিসের দেরি হয়ে যাবে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, একটা ওমলেট খান না, আরেক কাপ চায়ের সঙ্গে।

ময়ূরকে ডেকে বলল, ময়ূর তাড়াতাড়ি একটা ওমলেট ভেজে আন, আর টি-পটটা নিয়ে যা, চা নিয়ে আয় আবার।

আমি কিছু বললাম না।

আমি আজ তোমার ঘরে একটু বসে থাকতে চাই সুশান্ত, একটু ভাবতে চাই; আমি কী করব? আজ তুমি নিজের হাতে কিছু কোরো না, ওমলেট ভেজো না, তুমি আমার সামনে বসে থেকো, যাতে আমি বুঝতে পারি, জানতে পারি যে, এই পরবাসে আমার তবু একজন লোকও আছে যার কাছে আমি বিপদে যেতে পারি। একটুখন নিরুপদ্রবে শান্তিতে বাস করতে পারি।

সুশান্ত বলল, স্কুলে যাবেন না আজ?

—যাব। বললাম, আমি।

—আপনাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। হালকা গলায় বলল ও।

—হুঁ। আমি বললাম।

আর কিছু বলার ছিল না। ও আর কিছু জিজ্ঞেসও করল না।

আমার অফিসে আজ একটা বিশেষ কাজ আছে, ন'টার সময় বেরোতে হবে। ওমলেটটা আসুক, আর এক কাপ চা খান, তারপর আমি চান করতে যাব, কেমন? নইলে আমার দেরি হয়ে যাবে।

আমি বিব্রত হয়ে বললাম, ওমলেট, চা থাকুক, আমি চলি, নইলে আপনার দেরি হয়ে যাবে।

সুশান্ত বলল, দশ মিনিটে এমন কিছু দেরি হবে না।

আমি মুখ নিচু করে বসে রইলাম; কিছু বলা হল না।

চা ও ওমলেট এলে, আমি যেন ভিখারি এমনিভাবে যন্ত্রচালিতের মতো তাড়াতাড়ি খেলাম। চা-টা শেষ করে কাপটা নামিয়ে রাখলাম। কাপটা হাত ফসকে পড়ে যাচ্ছিল, কোনোরকমে ঠিক করে ডিশের ওপর বসালাম।

সুশান্ত তবুও চোখ তুলল না আমার দিকে; কথা বলল না; পথের দিকেই চেয়ে রইল।

একবার খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে হেডলাইনগুলোয় চোখ বোলাল, তারপর স্বগতোক্তি করল, কবে যে বৃষ্টি হবে; এভাবে বাঁচা যায় না।

তারপর একটু পরে সুশান্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, বলল, কিছু মনে করবেন না। এবার আমি চান করতে যাই। তারপর নিরুত্তাপ গলায় বলল, আবার আসবেন।

এই বলে কোনোদিকে না তাকিয়ে সুশান্ত পর্দার আড়ালে চলে গেল।

আমি আমার ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

সুশান্তর বাড়ির বাইরে এসে পথে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমার মনে হল, আমার কোথাও যাবার নেই। তবু যে পথে এসেছিলাম, সে পথেই আবার পা বাড়ালাম।

কোথায় যাব? এখন আমি কোথায় যাব ভেবে পেলাম না। সোনারির দিকে হাঁটতে লাগলাম।

গলার কাছে কী একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা দলা পাকিয়ে উঠে আসতে লাগল, সে যন্ত্রণার কোনো তল নেই।

রমেনের সম্বন্ধে এই মুহূর্তে আমার ঘৃণা ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতি নেই।

কিন্তু এই একই মুহূর্তে সুশান্তর উপর এক দারুণ অভিমানের তীব্রতা হঠাৎ আমার জীবনের

আর সমস্ত বোধকে আচ্ছন্ন করে অতিক্রম করে ফেলল। আমার মন, আমার সমস্ত অভিমানী মন বলতে লাগল, সুশান্তকে, বার বার বলতে লাগল, তুমি নিষ্ঠুর; তুমি বড় নিষ্ঠুর। আমার মন বলতে লাগল যে, সুশান্তর এই ক্ষণিকের শীতল উপেক্ষা রমেনের প্রতিদিনের চিৎকৃত উষ্ণ অসভ্যতার চেয়েও অনেক বেশি কষ্টদায়ক।

ব্যাগটা কাঁধে ফেলে সোনারির রাস্তায় আমি উদ্দেশ্যহীনের মতো হাঁটতে লাগলাম। আমার দু'চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এল।

কতক্ষণ এরকম একা একা হাঁটতে পারব জানি না। আমি জানি না।

আমি আধুনিকা, হতে পারি আমি শিক্ষিতা; তবুও আমি যে একজন নরম মনের চিরদিনের মেয়ে। কোনো পুরুষের হাতের অস্বস্তির উষ্ণ তালুতে হাত না রেখে যে আমরা হাঁটতে পারি না বেশিক্ষণ। এখনও পারি না। কোনোদিনও বুঝি পারব না। যারা আমার মতো অবস্থায় না পড়েছে, তারা আমার এ কথা যে কতবড় সত্যি তা বুঝবে না।

ধরার মতো কোনো হাত, কারও হাত আমার পাশে নেই—আজ আমার কেউই নেই।

সুশান্ত, তুমি ভীষণ খারাপ, তুমি অসভ্য, তুমি এক নম্বরের দাম্ভিক। আমার যা হবার তা হবে, কিন্তু আমি মরে গেলেও তোমার কাছে কখনো যাব না, কখনো কথা বলব না তোমার সঙ্গে।

তুমি দেখো; সত্যি বলছি, তুমি দেখো।

অসভ্য।

তুমি একটা ভীষণ অসভ্য।

৬

কাল গরমের ছুটি হয়ে যাবে।

আজই শেষ স্কুল ছিল। তারপর লম্বা ছুটি। খুলবে একেবারে জুলাই-এর গোড়ায়। আজকাল ছুটি হবে ভাবতেই আমার ভয় করে। সময়টা ভারী হয়ে থাকে। সময় আর কাটতে চায় না।

আজ আমার আর ক্লাস নেই। শেষ ক্লাস সেরে এসে কতকগুলো হোমওয়ার্কের খাতা দেখার ছিল ইংরেজির, সেগুলো দেখছিলাম টিচার্স রুমে বসে।

বেলা পড়ে এসেছিল, তবুও রোদের তাপ বেশ। স্কুলের মাঠটার দেওয়ালের পাশে পাশে সারি করে বোগেনভোলিয়া লাগানো আছে। মেরি-পামারই বেশি। বিভিন্ন রঙা ফুলের বিভিন্ন রঙা আভা সেই গরমের বিকেলের রুক্ষ মাঠে একটু বিধুর ছায়া এসেছে। একদল চড়াই ধুলোর মধ্যে, ধুলো উড়িয়ে, ধুলো ছড়িয়ে ওদের ছোট ছোট ঠোঁটে কিঁচকিঁচ করে কত কী বলছে আর খেলছে।

মালি কালো রবারের লম্বা পাইপ টেনে এনে মাঠে জল দিচ্ছে। গেটের কাছে বড় সোনাঝুরি গাছদুটোর ছায়া ঝুঁকে পড়েছে মাঠের পুব কোনায়।

জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকতে থাকতে আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। খাতাগুলো খোলা ছিল সামনে, খোলা পেনটা ধরা ছিল আঙুলে, কিন্তু আমার মন ছিল ঘরের বাইরে; দূরে। মন কোনো বিশেষ জায়গায় ছিল না, ছড়িয়ে ছিল অনেক জায়গায় আল্‌তো হয়ে, উদ্দেশ্যহীন হয়ে।

চমক ভাঙল স্কুলের বেয়ারা রামরতনের গলার স্বরে।

রামরতন বলল, দিদি আপ্‌কো কই বাবু বুলা রহা হ্যায়।

আমি চমকে উঠলাম। বললাম, অফিসের বাবু?

ও বলল, না, না, বাইরের বাবু, আপনার সঙ্গে ভেট করতে এসেছে।

কলমটা খোলা থাকায় শুকিয়ে গিয়েছিল। আমি কলম বন্ধ করে রাখলাম, খাতাগুলো মুড়ে রাখলাম।

বুঝতে পারলাম না কে এখানে আসতে পারে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে বাইরের লোক!

যে দু'বছর জামশেদপুরে এসেছি কখনও কেউ স্কুলে দেখা করতে আসেনি। এখানে রমেন কখনও আসবে না। ও বলে, আমার ভাবতেই খারাপ লাগে যে তোমার সহকর্মীরা আঙুল দেখিয়ে বলবে ঐ যেরে নিরুপমা ঘোষের হাজব্যান্ড।

তাছাড়া, রমেনের আমার সঙ্গে কোনো দরকার থাকে না আজকাল; দরকার নেই তো! ওর সবরকম খিদে নিবৃত্ত করা ছাড়া আমার আর কোনো প্রয়োজন বা দরকার ওর কাছে নেই এখন আর!

পুরুষ বলতে এখানে আমার হাজব্যান্ড রমেন ঘোষ ছাড়া আর তেমন চিনি শুধু সুশান্তকে। সুশান্ত সেদিন আমার প্রতি যেরকম ঠান্ডা ব্যাঙের মতো নিরুত্তাপ শীতল ব্যবহার করেছে, তাছাড়া ও যা দাম্ভিক, ও কখনও আসবে না আমার স্কুলে। আর ও যদি সত্যিই এসে থাকে, ওকে চলে যেতে বলব, দেখা করব না ওর সঙ্গে। কিংবা ও যেমন করেছিল আমার সঙ্গে সেদিন সেরকম করব।

বলব আমার খুব তাড়া আছে!

বলেই, ক্যান্টিন থেকে ওমলেট আর চা আনতে বলব ওর জন্যে। তারপর ও যখন ওগুলো খাবে, ওর সঙ্গে একটাও কথা বলব না, অন্যদিকে চেয়ে বসে থাকব। ওর খাওয়া হলে বলব, এবার আপনি আসুন, কেমন? আমার খুব তাড়া আছে আজ।

সুশান্ত একদিন আমাকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে। সে কষ্ট রমেনের দেওয়া কষ্টের চেয়ে অনেক বেশি। রমেনের দেওয়া কষ্ট, ওর সমস্ত রকম স্থূলতা, ওর সমস্ত চরিত্রের ভণ্ডামি এসব এখন আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। ওকে আমি এখন শুধু সহ্য করি। ওকে ভালোবাসি না, ওর জন্যে কোনোরকম ফিলিংস নেই আমার। সব কিছু মরে গেছে আমার মনের মধ্যে, যেসব সুগন্ধি ভালোলাগার বীজ আমার বুকের মধ্যে কুসুমিত হয়ে উঠেছিল ওর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর, ওকে সকলের অমতে বিয়ে করার পর; এখন সে সমস্ত কুসুম শুকিয়ে গেছে প্রখর তাপে। ওর আত্মসম্মানজ্ঞানহীনতার দারুণ দাবদাহে।

রামরতনকে বললাম, বাবুর কাছ থেকে একটা স্লিপ নিয়ে এসো নাম লিখে। কে বাবু দেখি।

রামরতন চলে গেল।

ও চলে যেতেই আমার হঠাৎ মনে হল কলকাতা থেকে কেউ আসেনি তো? কোনো খারাপ খবর নেই তো? বাবার কথা মনে হলেই খুব দুশ্চিন্তা হয়।

যতক্ষণ না রামরতন ফেরে ততক্ষণ আমি বসে রইলাম।

রামরতন ফিরে এল একটা কার্ড নিয়ে হাতে।

কার্ডটা তুলে নিয়ে দেখি লেখা আছে ইংরেজিতে সুশান্ত বোস। এরিয়া সেল্‌স ইনচার্জ, ইনসাফ এবং ট্রব ইঞ্জিনিয়ারিং কোং অব ইন্ডিয়া, জামশেদপুর। তারপর ওর ঠিকানা-টিকানা সব দেওয়া আছে।

সুশান্তর নামটা দেখেই আমার বুকের মধ্যেটা খুশিতে চল্‌কে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল আমার উচিত নয় ওকে বেশি পাত্তা দেওয়া। ওকি ভেবেছে, আমার কী সুশান্ত ছাড়া আর কেউ নেই যে ও আমার সঙ্গে যেরকম খুশি সেরকম ব্যবহার করবে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই খেয়াল হল শাড়িটা ক্রাশ্‌ড হয়ে গেছে। আমি তো জানতাম না আজ সুশান্ত আসবে। যাক্, এখন আর কিছু করার নেই।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে চিরুনিটা বের করে চুলটা একটু ঠিক করে নিলাম, মুখে একটু পাউডার পাফটা বুলিয়ে নিলাম আলতো করে, তারপর মাঠ পেরিয়ে বাইরের অফিসের ওয়েটিং হল-এর দিকে এগিয়ে গেলাম।

জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম সুশান্ত বসে আছে। একটা সাদা ট্রাউজার, সাদা শার্ট তার উপরে একটা মেরুনের ওপরে কালো কাজ করা টাই।

সুশান্ত মুখ নিচু করে বসে ছিল।

আমি ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল। কোনো কথা বলল না।

আমি আশ্চর্য হবার গলায় বললাম, আপনি হঠাৎ এখানে? কী মনে করে?

সুশান্ত হাসবার চেষ্টা করল। বলল, কিছু মনে করে না। এমনিই।

তারপরই বলল, আপনার ছুটি হতে দেরি আছে?

আমি বললাম, কেন বলুন তো?

ও বলল, না, তাহলে একসঙ্গে যেতাম।

সেদিনের সেই প্রচ্ছন্ন অথচ সুগভীর অপমানের কথা আমার মনে ছিল। আমি বললাম, আমার তো যেতে অনেক দেরি হবে।

সুশান্ত হাত দুটো বুকের সামনে আড়াআড়ি করে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কত দেরি হবে?

আমি বললাম, তা বলতে পারছি না। এক ঘণ্টাও হতে পারে দু'ঘণ্টাও হতে পারে।

সুশান্ত আমার চোখের দিকে একবার তাকাল, তারপর বলল, ওঃ। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি তাহলে চলি।

আমি বললাম, আপনি আমাকে কিছু বলতেন?

সুশান্ত বলল, না। তেমন জরুরি কিছু নয়। পরে বললেও চলবে। এখন আসি।

এই বলে সুশান্ত চলে গেল।

সুশান্ত চলে যেতেই আমার সমস্ত মন হাহাকারে ভরে গেল। নিজেকে নিজে খুব বকতে লাগলাম। বলতে লাগলাম, তোমার এই কাঠ-ফাঠা জায়গায় সুশান্ত ছাড়া আর কে আছে। ও নিজে যেচে এত দূরে এল অফিস থেকে উলটো দিকে, আর তুমি মিথ্যা গর্বে অভিমানে তাকে তাড়িয়ে দিলে।

আমি ঠিক করলাম, এক্ষুনি স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়ে আমি বাড়ি যাব। বাড়ি ফিরে গা-টা ধুয়ে সুশান্তর বাড়ি যাব। আজ বেশ ভাব হয়ে যাবে আবার আমাদের দুজনের। আমি আজ ওকে বলব, ওর কাছে স্বীকার করব যে, আমি কতখানি নির্ভর করে থাকি ওর ওপর। মনে মনে আমি কতখানি নিজের লোক বলে জানি ওকে।

কিন্তু ভয় হল যদি ও তাড়াতাড়ি না ফেরে?

যাই হোক টিচার্স রুমে গিয়ে আমার সেদিন আর খাতা দেখা হল না। তাড়াতাড়ি করে সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে আমি ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এখন রোদ প্রায় পড়ে এসেছে, তবুও বাস স্ট্যান্ড অবধি হেঁটে যেতে বিকেলেও কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় রমেন বিয়ের আগে আমাকে যা যা বলেছিল তা যদি সত্যি হত, তো বেশ হত। ও যদি ইতিমধ্যে একটা গাড়ি পেত তাহলে রোদের মধ্যে রোজ আমাকে কষ্ট করে এতখানি যেতে হত না। বিয়ের আগে ও অনেক কথা আমাকে বানিয়ে বানিয়ে বলেছিল বলেই এখন ওর কথাগুলো এমন করে মনে পড়ে বার বার।

স্কুলের গেট থেকে বাইরে বেরিয়েই দেখি সুশান্ত সামনের চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে আছে ত্রিপলের তলায়।

ঐ পরিবেশে, ঐরকম ভাঙা ও নড়বড়ে টিনের চেয়ারে সুশান্তর সম্ভ্রান্ত চেহারা ও পোশাক কেমন বেমানান লাগছিল।

ও আমাকে আসতে দেখেই উঠে দাঁড়াল। হাসল। তারপর এগিয়ে এল আমার দিকে। তারপর বলল, বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখেননি বলে ধন্যবাদ।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, আমার দুটো ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হেডমিস্ট্রেস বললেন যে উনি নিজেই নেবেন।

সুশান্ত আমার চোখের দিকে চেয়ে কথাগুলো রিপিট করল, বলল, তাহলে উনি নিজেই নেবেন?

পরক্ষণেই বলল, মিথ্যা কথা বলতে শিখতে হয়। এরকমভাবে মিথ্যা কথা যারা বলে, তারা সহজেই ধরা পড়ে যায়। তাদের চোখই ধরিয়ে দেয়। কিন্তু মিথ্যা কথা কেন? আমি যদি আপনাকে বিরক্ত করে থাকি এসে, তো বলুন চলে যাচ্ছি।

আমি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে হাঁটতে লাগলাম। কথা বললাম না।

সুশান্ত বলল, ওদিকে কোথায় চললেন। আমরা ওদিকে যাব না।

মানে? আমি বললাম।

সুশান্ত বলল, উলটোদিকে চলুন। মোড়ে একটা ট্যাক্সি নিশ্চয়ই পেয়ে যাব। চলুন রিভার্স-মিট-এ যাই। আপনি গেছেন কখনও?

না। যাব যাব ভেবেছি। কিন্তু যাওয়া হয়নি। ওরকম জায়গায় একা গিয়ে লাভ কী? একা কি ভালো লাগে?

সুশান্ত হাসল। বলল, আমি কিন্তু প্রায়ই একাই যাই, গিয়ে চুপ করে বসে থাকি। অবশ্য একা থাকতে ভালোবাসি বলেই হয়তো ভালো লাগে।

তাহলে আজকে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন? যদি ভালো না লাগে?

নাও লাগতে পারে। ভালো লাগে কি না তা পরখ করার জন্যেই তো আপনাকে নিয়ে যাওয়া।

মোড় থেকে সুশান্ত একটা ট্যাক্সি নিল। তারপর দেখতে দেখতে ট্যাক্সি জনবহুল জায়গা ছাড়িয়ে নির্জনে এসে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে।

বড় বড় শালগাছ ভরা জায়গাটিতে আমরা এসে পৌঁছলাম।

সুশান্ত ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে রাখল। তারপর আমার পাশে পাশে হেঁটে চলল নদীর দিকে।

সুবর্ণরেখা আর খড়াই নদী এসে মিশেছে এ জায়গাটাতে। ভারী সুন্দর জায়গা। এখন দু'নদীতেই জল নেই বললেই চলে। শুধু মধ্যে দিয়ে তিরতির করে জল বয়ে চলেছে। দু'পাশে গভীর জঙ্গল। সুবর্ণরেখার অন্য পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে দু-একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। গোরুর পাল নিয়ে রাখাল ছেলে জল পেরিয়ে জঙ্গলের গ্রামে ফিরছে।

চতুর্দিকে একটা দারুণ শান্তি। নদীর গেরুয়া বালির ওপরে বড় বড় গাছের ছায়া লম্বা হয়ে পড়েছে। দূরে নদীর ওপরে স্থানীয় কোনো কলেজের ছেলে গোল হয়ে বসে গল্প করছে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান গাইছে। ওদের এই চেঁচামেচি কিন্তু খারাপ লাগছে না। তাতে জায়গাটার নির্জনতা ও শান্তি যেন আরও বেড়ে গেছে।

সুশান্ত বলল, ভালো লাগছে?

আমি বললাম, খুউব।

বসবেন না? সুশান্ত বলল।

আমি কথা না বলে একটা পাথরের ওপর বসে পড়লাম গাছের ছায়ায়। সুশান্ত আমার সামনে ট্রাউজার পরেই আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল।

অনেকক্ষণ আমরা কেউই কোনো কথা বললাম না।

সুশান্ত বলল, সেদিন আপনি খুব রেগে গেছিলেন না?

আমি হাসলাম, কথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে বললাম, কই না তো? রাগব কেন?

সুশান্ত বলল, কী করব? রাগ করলে করেছেন। আমার সত্যিই তাড়া ছিল সেদিন।

আমি কিছু বললাম না।

হঠাৎ সুশান্ত বলল, একটা গান শোনাবেন?

গান? আমি আকাশ থেকে পড়লাম। আমি যে কোনোদিন গান গাইতে পারতাম সে কথাই যেন আমি ভুলে গিয়েছিলাম। বিয়ের আগে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে গাইয়ে বলে আমার রীতিমতো সুনাম ছিল। তবে শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতাম। তারপর এই আড়াই বছরে রমেন কখনও আমার গান শুনতে চায়নি, একটিও রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড কেনেনি। আর কিনলেও বা বাজাতাম কী করে? রেকর্ড প্লেয়ার কোথায়?

সুশান্ত আবার বলল, কী? সাধতে হবে বুঝি?

আমি লজ্জা পেলাম, বললাম, কতদিন গাই না, ভুলে গেছি।

ও বলল, ভুলে যাওয়া গানই গান না হয়।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে খুব নিচু গলায় গাইলাম,

"অশ্রু নদীর সুদূর পাড়ে
ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে।"

সুশান্ত মন দিয়ে গান শুনল।

তারপর গান শেষ হলে হাততালি দিল না, সাধু সাধু বলল না, শুধু আমার দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

তারপর বলল, ভারী ভালো লাগল। এমন গলা, গান না গেয়ে আপনি নষ্ট করছেন কেন?

কত কিছুই তো নষ্ট হয়ে গেল। শুধু গান বাঁচিয়ে রেখে আর কী হবে?

সুশান্ত আমার দিকে তাকাল পূর্ণ দৃষ্টিতে। বলল, কিছুই নষ্ট হয় না, নিজে নষ্ট না করলে। আপনি নিজে নষ্ট করলে, বলার কিছুই নেই।

প্রথম "কিছুই" কথাটা এমন একটা বিশেষ জোর দিয়ে বলল ও যে, আমার কানে লাগল।

আমি চমকে মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে।

সুশান্ত চোখ নামিয়ে নিল।

সুশান্ত হঠাৎ বলল, রমেনবাবু কেমন আছেন?

আমার মাথায় কে যেন হাতুড়ি মারল। ঠিক এই মুহূর্তে, এই সময়, এই পরিবেশে যখন আমার আর সুশান্তর মধ্যে অন্য কেউই নেই, তখন হঠাৎ অন্য একজন লোকের প্রসঙ্গ এখানে টেনে আনার কী প্রয়োজন ছিল জানি না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বললাম, জানি না।

কথাটা বলেই আমার খারাপ লাগল।

আফটার অল্ রমেন আমার স্বামী, ওর প্রসঙ্গে কোনো অসম্মানসূচক কথা আমার বলা উচিত নয়, বলিওনি কখনও। অন্য কাউকে কখনও বলিনি। কিন্তু সুশান্তর সামনে আমার মিথ্যা ভান করতে

ইচ্ছে করল না। কেন জানি না, কিছুদিন থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যে, সুশান্তর সঙ্গে সম্পর্কটা আমার ভান করার নয়।

সুশান্ত দূরে তাকিয়েছিল।

আমি বসে বসে ভাবছিলাম যে প্রত্যেক মানুষের জীবনেই দু'একটি সম্পর্ক থাকে যেখানে কোনো বিষয়েই কখনও ভান করতে নেই। ভান বা ভণ্ডামি করলে সেই সমস্ত সম্পর্কের শিকড় আলগা হয়ে যায়। এই ভাসমান সতত সঞ্চরমান সম্পর্ক ভরা পৃথিবীতে যদি অন্তত দু-একটা সম্পর্কের মধ্যে কেউ তার মনের শিকড় প্রোথিত না রাখে, না রাখে সততায়, তবে তার জীবনময়ই যাযাবরের মতো এ মনে ও মনে ঘুরে বেড়াতে হয় স্থায়িত্বের মিথ্যা আশ্রয়। আমার মনে হয়, আমার জীবনে সুশান্ত তেমনই একজন লোক, যার সঙ্গে ভান মন করলে শুধু নিজেকেই ঠকানো হবে।

সুশান্ত আবার বলল, রমেনবাবুর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না। ওঁর শরীর ভালো আছে?

আমি এবার বিরক্ত গলায় বললাম, রমেনবাবুর কথা রমেনবাবুই ভালো জানেন। আপনি গিয়েই তো শুধোলে পারেন। আমাকে বলার মতো কোনো কথাই কি আপনার নেই?

সুশান্ত অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল। বলল, আপনার কথা আমি জানি। আমারও রমেনবাবুর প্রতি তেমন কোনো ইন্টারেস্ট নেই। আপনার খবরের জন্যেই রমেনবাবুর খবর নেওয়া। আপনি কি এ কথা অস্বীকার করেন যে রমেনবাবুর ভালো-মন্দর সঙ্গে আপনার ভালো-মন্দ জড়ানো নেই?

আমি বললাম, না, এখন অবধি অস্বীকার করি না। হয়তো কোনোদিন করব।

এখনও অস্বীকার করেন না বলেই এ কথা শুধিয়েছিলাম।

যাক্ গে, অন্য কথা বলুন। ও বলল।

আমি বললাম, অন্য কথা নেই। আর কী কথা? সন্ধে হয়ে গেল। চলুন বাড়ি যাই।

সুশান্ত বলল, আর একটু বসুন। আমার খুব খিদে পেয়েছে। আপনারও নিশ্চয়ই পেয়েছে। চলুন ফেরার সময় কোয়ালিটিতে কফি খেয়ে যাওয়া যাবে। আপনার কি সত্যিই তাড়া আছে?

আমি বললাম, না। তেমন তাড়া নেই।

মনে মনে বললাম, সুশান্ত তুমি জানো না, তোমার সঙ্গে আমি সারা দিন, সারা রাত কাটাতে পারি। তোমার সঙ্গ আমার বড় ভালো লাগে। তোমার সঙ্গে আমার আগে কেন দেখা হল না সুশান্ত? তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

সুশান্ত হঠাৎ বলল, আপনার পায়ের পাতাদুটো কী সুন্দর। এমন সুন্দর পা নিয়ে ধুলোর মধ্যে হাঁটা আপনাকে মানায় না।

আমি হাসলাম। বললাম, তাহলে কী করব? উড়ে যাব?

সুশান্তও হাসল। বলল, না, তা নয়, আপনি যদি আমার আপন কেউ হতেন তাহলে আপনার পা আমি মাটিতে পড়তে দিতাম না।

আমি হাসলাম। জানি না সেই হাসিটা কেমন দেখাল। ওকে বললাম, ও প্রসঙ্গ থাক। আমি যখন আপনার আপন কেউ নই তখন আমাকে ধুলো মাড়িয়েই চলতে হবে, কাঁটা পাথর সব কিছুর ওপর দিয়ে। উপায় কী?

সুশান্ত আবার বলল, উপায় আছে কী নেই জানি না। তবে আমার বড় খারাপ লাগে। বিশ্বাস করুন, আপনার জন্যে এত খারাপ লাগে যে কী বলব।

আমি বললাম, আমার জন্যে খারাপ লাগার তো কোনো দরকার দেখি না। নিজের দিকে তাকান, নিজের ভালো ভাবুন, দেখবেন আর বাইরের কারও কথা ভেবে নিজের সময় নষ্ট হবে না। সত্যি!

আপনার কিন্তু নিজের কথা ভাবার সময় হয়েছে। আপনি যেন কীরকম? নিজের দিকে তাকান না কেন?

তাকাই তো। সবসময় তাকাই। নিজের দিকে তাকালে কেবলই অন্য একজনকে দেখতে পাই।

আমি চমকে উঠে বললাম, কাকে?

সুশান্ত যেন খুব ভাবনায় পড়েছে, এমনভাবে বলল, তার প্রকৃত স্বরূপ এখনও বুঝে উঠতে পারিনি, তার রূপও নয়। যেই তাকাই ভিতরের দিকে অমনি দেখি কে যেন দৌড়ে গেল হালকা পায়ে বাইরের দিকে। তার অস্তিত্ব দারুণভাবে উপলব্ধি করি, সে যে আছে তা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি, কিন্তু সে কী এবং কে তা জানতে পারি না।

খুব অস্বস্তিকর অবস্থা, না?

আমি বললাম, হবে। তারপর বললাম, ভালো করে তাকান, তাকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে চান তো তাকে নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন।

পাব? সুশান্ত বলল।

পরক্ষণেই লাজুক হাসি হেসে বলল, আমারও মনে হয় তাই।

কী মনে হয়? আমি বললাম।

মনে হয় যে একদিন তাকে সমস্ত কুয়াশা ও ধোঁয়ার বাইরে তাকে তার সহজ স্বচ্ছন্দ সম্পূর্ণতায় প্রত্যক্ষ করব।

আমি মুখ নীচু করে বসেছিলাম।

সেই সুবর্ণরেখার পাড়ে, শেষ বিকেলের আকাশের সব রঙ, বনের গায়ের সব পূরবী গন্ধ, রাখাল ছেলের গলার স্বর সমস্ত মিলেমিশে আমার মুখের ভাবনায় আঁকা হয়ে গিয়ে আমার মুখটি একটি প্রসন্ন প্রতিবিম্ব হয়ে উঠল আমার মনের।

সুশান্ত হঠাৎ আমার চিবুকে হাত ছোঁওয়াল।

আমার সারা শরীর, শরীরের সমস্ত অণু-পরমাণু, শরীরের কেন্দ্রবিন্দু, আমার সর্বস্ব সব থর থর করে কেঁপে উঠল সেই আঙুলের আদরের একটু ছোঁওয়ায়।

সুশান্ত বলল, নিজের মনেই, আপনি ভীষণ সুন্দর, আপনার মতো সুন্দর কিছু আমি কখনও দেখিনি।

তারপরই বলল, আপনি এত সুন্দর কেন?

আমি বাচ্চা মেয়ের মতো রাঙিয়ে গেলাম লজ্জায়।

আজ অবধি এ কথা আমাকে অনেক পুরুষ বলেছে। রমেন বলেছে বহুবার বিয়ের আগে। কিন্তু কেউ এমন করে বলেনি। হঠাৎ আমার মনে হল সুশান্তর মতো এত সুন্দর করে আমার সৌন্দর্যের কথা কেউ কখনও বলেনি। আমার সৌন্দর্য যদি সত্যিই কিছু থেকে থাকে তাহলে সেই সৌন্দর্যর এই প্রশস্তি তার চেয়েও সুন্দর।

আমি হাসছিলাম, আইসক্রিম-খাওয়া বাচ্চা মেয়ের মতো আমি খুশিতে হাসছিলাম; এত খুশি আমি বহুদিন হইনি।

আমি হাসি থামিয়ে বললাম, সুন্দরী মেয়েরা কিন্তু পাজি হয়।

সুশান্ত বলল, জানি না, জানতে চাই। বলেই সুশান্ত হঠাৎ আমার কোলে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

আমি লজ্জিত হলাম, কিন্তু ভীষণ ভালোও লাগল আমার।

বললাম, এই, কেউ দেখে ফেলবে। কী হচ্ছে?

সুশান্ত বলল, দেখুক না; ওরা দেখুক এসে। দেখে হিংসেয় মরুক।

তারপরই সুশান্ত বলল, জানো আজ অফিসে ভীষণ ঝগড়া করে এসেছি। মনটা বড় খারাপ ছিল, কী যে খারাপ, তোমাকে তা বোঝাতে পারব না নিরুপমা।

অফিস থেকে বেরিয়ে কেবলি তোমার কথা মনে হতে লাগল। মনে হল তোমার কোলে মাথা দিয়ে একবার শুলে আমার সমস্ত মন খারাপ চলে যাবে। তাই তুমি কী ভাববে কেয়ার না করে তোমার কাছে দৌড়ে চলে এলাম। তুমি যে নিরুপমা। বলো? অন্যায় করেছি?

আমি ওর কপালে হাত রেখে বললাম, না। অন্যায় করেননি।

ও আমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছিল। আমার কী যে ভালো লাগছিল কী বলব? ওর চরিত্রের মধ্যে রমেনের মতো কোনো ভিক্ষা চাওয়ার ব্যাপার ছিল না। ওর মধ্যে দারুণ একটা আত্মবিশ্বাস ছিল। যাকে ওর নিজের বলে মনে মনে ও মনস্থ করেছে, তা যে নিঃসন্দেহে ওর নিজেরই এই ব্যাপারে ওর মনে কোনো সংশয় ছিল না। আর যা ওরই একান্ত, তাকে নিয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছে ফুরিয়ে যাচ্ছে আদেখ্‌লেপনাও ছিল না। কোনোরকম। ওর কথাই আমার সমস্ত শরীরে যা সুখের হিল্লোর তুলেছিল, আমার মনে যা রাশ রাশ পুঁটিলেখা ফুটিয়ে তুলছিল, জানি না ওর পরশ আমার মধ্যে কোন্ গভীর আনন্দের ঝড় তুলবে। সে আনন্দের ভার কি আমি সইতে পারব?

সুশান্ত বলল, তুমি আমাকে আপনি বলছ কেন? পালাবার পথ খোলা রাখতে চাও বুঝি? ইচ্ছে করলেই বাতিল করে পালাবে বলে দূরে রাখছ?

আমি হাসলাম। বললাম, মোটেই না।

ও বলল, তবে?

সবাইকে আপনি বলা যায় না। আপনি আমার চেয়ে সবদিক দিয়ে বড়। আপনার মতো কাউকে তুমি বলতে আমার ভালো লাগে না।

সুশান্ত এক লাফে উঠে বসল। বসেই অবাক হয়ে বলল, আমার মধ্যে গুণের কী দেখলে তুমি? আমি তোমার পায়ের নখের যোগ্য নয়।

আমি বললাম, সেটা আমি বুঝব। আপনি বললে আপনি অখুশি হবেন?

সুশান্ত হাসল। খুব জোরে জোরে হাসল। বলল, আমি এখন দারুণ খুশি। এত খুশি আমি ছোটোবেলা থেকে কখনও হইনি। তুমি যাই-ই করো, যাই-ই বলো ; আমি অখুশি হব না। কখনও হব না! তুমি দেখো।

তারপর আবার সুশান্ত আমার কোলে শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়েই দু'হাত দিয়ে আমার মুখটা ওর মুখের কাছে নামিয়ে আনল। কিন্তু ঠোঁটে চুমু খেল না। প্রথমে ও আমার দু'চোখে আলতোভাবে চুমু খেতে লাগল।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ও কী? অন্ধ হয়ে যাব যে।

সুশান্ত বলল, অন্ধ হবে না, তোমার দিব্যদৃষ্টি হবে ; তুমি আমাকে আমার সত্যিকারের আমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর দেখবে।

তারপর সুশান্ত উঠে বসে আমার চোখে মুখে বুকে হাজার চুমু খেলো।

একটু বিরাম দিয়ে সুশান্ত ওর দু'হাতের তেলোর মধ্যে আমার মুখ ধরল, বলল, আমি আজকে ঔরঙ্গজেব হয়ে গেলাম। ভাবছি, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে আজ একটা জায়গীর দিয়ে দেব।

তারপরই বলল, তোমার কিছু চাই নিরুপমা? জাহাঁপনার কাছে তুমি কিছু চাইবে না?

আমি হাসছিলাম। আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত। সুশান্তর মধ্যে যেন

কী একটা ছিল—কোনো জাদুকরের জাদুর মতো, অজগরের চাউনির মতো, কিন্তু তাতে কোনো ভয় ছিল না। শুধু আকর্ষণ ছিল।

সুশান্ত আবার বলল, বলো না? তোমার কিছু চাই না?

আমি খুব হাসতে হাসতে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিলাম, জাহাঁপনাকে চাই।

সুশান্ত আমার ডান হাতটা ওর ঠোঁটের কাছে তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে বলেছিল, আমি তোমার! আমি চিরদিনের তোমার।

৭

ছিঃ ছিঃ এ আমি কী করলাম, কেমন করে করলাম?

ভালো হোক, খারাপ হোক, রমেন আমার স্বামী। এখনও সে আমার স্বামী। আমি তার বিবাহিতা স্ত্রী। স্বামী থাকতে অন্য পুরুষের সঙ্গে এরকম সম্পর্ক যে রাখে তাকে কি কেউ ভালো বলে? লোকে জানতে পারলে কী বলবে?

ফেরার সময় ট্যাক্সিতে বসে আমি নিজেকে নিজে অভিশাপ দিচ্ছিলাম।

সুশান্ত আমার হাতটা ওর হাতে নিয়ে চুপ করে বসেছিল। কোনো কথা বলছিল না।

দেখে মনে হচ্ছিল ও আনন্দের ভারে ক্লান্ত হয়ে গেছে।

আমি হঠাৎ বললাম, আজ আর বিষ্টুপুর যাব না বুঝলেন। দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই। ও হয়তো অফিস থেকে ফিরে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। অন্য একদিন যাব এখন, কেমন? না কি আপনি রাগ করলেন?

সুশান্ত চশমার আড়ালের গভীর কালো চোখ দুটি তুলে তাকাল আমার দিকে। বলল, ঠিক আছে। তুমি যেমন বলবে।

সুশান্তকে এখন দেখে ভাবাই যাচ্ছিল না যে একটু আগেই ও প্রগলভ্ হয়ে গিয়েছিল, অত কথা বলছিল, আমাকে অমন পাগলের মতো আদর করছিল। এখন দেখে মনে হচ্ছে ও নিউক্লিয়র ফিজিক্স-এর প্রফেসর বুঝি, এক্ষুনি কোনো তত্ত্ব নিয়ে পড়বে।

সুশান্তর এই চেহারাটাই আমার ভালো লাগে। ওর গাম্ভীর্য, ওর সম্ভ্রান্ত ঋজু চেহারা, ওর গলার স্বর এসব মিলিয়ে মনে হয় এরকম কোনো ছেলে যে-কোনো মেয়ের দায়িত্ব নিতে পারে সারা জীবনের। এরকম কারও উপর নির্ভর করলে শুধু নিজে সুখী ও নিশ্চিত হওয়াই যায় না, নিজে সম্মানিতও হওয়া যায়। মাথা উঁচু করে দশজনকে বলা যায়, এই যে, ইনি আমার স্বামী। যেদিন রমেনের সঙ্গে ওর কারখানায় গিয়েছিলাম, সেদিনের কথা আমার বারে বারেই মনে হয়, মনে পড়ে যায়। সেদিন সত্যিই লজ্জা করছিল আমার। আমার স্বামী যদি গরিব হত তাতে আমার কোনো লজ্জা ছিল না। আমি অমন চালিয়াৎ পরিবারে মানুষ হইনি। আমরা নিজেরাও কিছু বড়লোক ছিলাম না কখনও; কিন্তু চিরদিনই সম্ভ্রান্ত ছিলাম। টাকা ছিল না; কিন্তু সম্মান ছিল; সততার সরলতার পরিচয় ছিল। নিজের অসম্পূর্ণতার জন্যে যদি কোনো অপমানের সম্মুখীন হতে হয়, সে অপমান আমি হাসিমুখে সইতে রাজি ছিলাম। কিন্তু অন্য একজনের কৃত ও অকৃত কর্মের সমস্ত দায়িত্ব আমি যেহেতু তাকে একদিন বিয়ে করেছিলাম তাই আমার ওপর বর্তাবে এ কথা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছিল। সবসময় খারাপ লাগত।

সেদিন শেফালি যেভাবে আমাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে যাবার জন্যে বলছিল তাতে আমার

রীতিমতো অপমান লেগেছিল। রমেনও যদি ঐ কোম্পানির একজন ডিরেক্টর কী নিদেনপক্ষে একজন কেউ-কেটা হত তাহলে কি ওরা আমাকে অমন করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারত?

কিন্তু কোনো উপায় ছিল না। সেখানে নিরুপমা চৌধুরি কেউ নয়, সেখানে সে গিয়েছিল বমেন রায়ের স্ত্রী হিসেবে। মিসেস রমেন রায় হিসেবে। ঈস্ রমেন যদি ও যেমন তেমন না হত। ও যদি এমন করে আমাকে এ জীবনে না ঠকাত!

হঠাৎ সুশান্ত বলল, তুমি বলেছিলে না গরমের ছুটিতে কোলকাতায় যাবে বাবার কাছে? কবে যাবে?

বললাম, যাব তো নিশ্চয়ই। তবে দেখি কবে যাই। যাওয়াটা তো সমস্যা নয়। যে-কোনোদিন সকালের স্টিল এক্সপ্রেসে চেপে বসলেই হল।

সুশান্ত বলল, তা ঠিক।

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, তোমার কাছে আজ না গেলেই ভালো হত।

কেন? ওকথা বলছেন কেন? আমি শুধোলাম।

না। তুমি চলে গেলে খুব খারাপ লাগবে। তোমার সঙ্গে আজ যে ঘনিষ্ঠতা হল তা না হলেও খারাপ লাগত, তবে এখন আরও বেশি খারাপ লাগবে। জানি না তুমি লক্ষ্য করেছ কি না, আমার কোনো বান্ধুবান্ধব নেই। চিরদিনই আমি একলা। তার প্রধান কারণ আমার পছন্দ-অপছন্দটা বড় বেশি, রুচিজ্ঞানটাও বড বাড়াবাড়ি রকমের তীব্র। আমার যাকে-তাকে মোটে পছন্দ হয় না। বলার মতো কোনো কথা না থাকলেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা আজে-বাজে আলোচনা করে সময় নষ্ট করাকে ক্রিমিনাল অফেন্স বলে মনে হয় আমার। তার চেয়ে নিজের ঘরে বসে পড়াশুনা করা অনেক ভালো। বান্ধবীর বেলাতেও তাই। তুমি নিশ্চযই লক্ষ্য করেছ যে আমার একজনও বান্ধবী নেই। কেন জানি না তোমাকে প্রথম দিন দেখার পর থেকেই এত কষ্ট পেয়েছি তা তুমি কখনও জানতেও পারবে না।

আজ যে তোমার স্কুলে গিয়ে পৌঁছেছিলাম সে কী এমনি এমনি, অফিসের ব্যাপারে মন খারাপ করে তোমার কথা মনে হল প্রথম। আজ ভেবেই গিয়েছিলাম, তোমাকে খোলাখুলিভাবে কিছু বলব। ভেবেছিলাম, এভাবে কেউ বাঁচতে পাবে না।

আমি বললাম, আপনার ভয় করে না, বিবাহিতা মেয়েকে ভালোবাসতে? আপনি জানেন, রমেন আপনাকে জড়িয়ে ফেললে তার পরিণাম কী হবে?

কীসের পরিণাম?

দুর্নাম। লোকসমাজের কাছে ছিঃ ছিঃ, তারপর হয়তো অর্থদণ্ড। জেলও তো হতে পারে।

তা পারে, সবই হতে পারে।

তবে? সব জেনেশুনে আপনি কেন এমন করছেন?

কী করব বলো? আমি যে তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। এর পরে তো আমার আর করণীয় কিছুই নেই। ভালোবাসার ভান করিনি। সত্যি সত্যি ভালোবেসে ফেলেছি। এর জন্যে যদি শাস্তি কিছু পেতে হয়, এটা যদি দোষ বলে গণ্য হয়, তবে শাস্তি পাব। ওসব শাস্তিকে ভয় করি না। একমাত্র ভয় অন্য শাস্তিকে।

কোন্ শাস্তি? আমি শুধোলাম।

সুশান্ত বলল, তোমার কাছে শাস্তি। যাকে ভালোবেসে এত কষ্ট, সে যদি সে ভালোবাসা গ্রহণ না করে, তার চেয়ে শাস্তি আর কিছু নেই।

আমি বললাম, একথা সত্যি যে আপনি আমার জন্যে অনেক কষ্ট পেয়েছেন? আশ্চর্য। আগে বলেননি কেন? কেন বলেননি?

কী বলব? বলে সুশান্ত হাসল।

আমি বললাম, বলতেন; যা বলার।

সুশান্ত আবার হাসল। বলল, আমি কখনও তোমাকে এসে বলতে পারতাম না যে, "আমি তোমাকে ভালোবাসি।" জীবনটা তো যাত্রা নয়। একথা আজ বলা চলে কিন্তু সেই প্রথম প্রথম দিনে যেত না। তাছাড়া, ভালোবাসা কি কেউ কখনও মুখে বলে বোঝাতে পারে? আর একজনের প্রতি অন্য জনের মনোভাব, তার জন্য কনসিডারেশান, তার জন্যে কিছু করা, তার পাশে দাঁড়ানো, তার বিপদে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়া, তার জন্যে সব সময় ফিল করা এই তো ভালোবাসা। এ যে করে, সে ভালো নিশ্চয়ই বাসে। এ কথা মুখে বলে কী লাভ হত বলো? বরং জোলো লাগত পুরো ব্যাপারটাই। তাছাড়া আমরা কেউ কলেজের ছাত্র নই যে অমন নাটক করতে পারতাম ভালোবাসা নিয়ে।

দেখতে দেখতে বাড়ি এসে গেল।

সুশান্তর বাড়ির সামনেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম।

সুশান্ত নামার সময় আমার হাতে একটু চাপ দিয়ে নামল। বলল, যখনই একা লাগবে, মন খারাপ লাগবে চলে এসো। এরকম নিরাপদ ব্যাচিলারের বাড়ি ভূ-ভারতে নেই। বিপদ যদি কখনও ঘটে, তুমি চাও বলেই ঘটবে। অন্য পক্ষের ইচ্ছায় কখনোই তা ঘটবে না। এইটুকু কথা তোমাকে দিতে পারি। তুমি যদি আমার সামনে বসে থাক, তোমাকে যদি আশ মিটিয়ে দেখতে পারি তাহলেই আমার ভারী আনন্দ হবে। বুঝেছ? বেশি চাই না।

আমি বললাম, বুঝেছি।

ট্যাক্সি থেকে নেমে আমি বাড়ির দিকে হেঁটে চললাম।

আমার ভারী ভালো লাগছিল সেই সন্ধেবেলায়। মনে হচ্ছিল আমি যেন কোনো ফার্স্ট ইয়ারে পড়া মেয়ে হয়ে গিয়েছি। সমস্ত শরীর পাখির মতো হালকা, মন যুঁইফুলের মতো সাদা।

একসময় আমি যেন উড়ে গিয়ে পৌঁছলাম বাড়ির দরজায়।

আশ্চর্য। রমেন আজ এখনও আসেনি।

মুখী এসে দরজা খুলল। হাতের ব্যাগটা বিছানায় ছুড়ে ফেলে অনেকক্ষণ অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকলাম।

মুখী এসে বলল, দিদিমণি, চা-জলখাবার খাবেন না?

আমি বললাম, তুই খেয়ে নে।

সুশান্তর সঙ্গে একঘণ্টা কাটিয়ে আমি আনন্দে বিবশ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার সমস্ত শরীর আনন্দের ভারে ভারী বলে মনে হচ্ছিল। রমেন আমাকে একঘণ্টা ধরে নগ্নাবস্থায় আদর করলেও সে ভালোলাগার ক্লান্তি এমন আশ্চর্য সুখময় হত না।

আনন্দে আমার চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। বালিশে মুখ গুঁজে আমি বিড় বিড় করে বললাম, সুশান্ত তুমি ভারী ভালো। সুশান্ত তুমি ভীষণ ভালো।

আমি বোধহয় ঐভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কলিং বেলটা অনেকক্ষণ ধরে বাজছিল। ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখি, পুলিশ!

পুলিশের দারোগা হিন্দিতে বললেন, এটা রমেন রায়ের বাড়ি?

আমি বললাম, হ্যাঁ। কী ব্যাপার?

উনি বললেন, রমেনকে এক জুয়ার আড্ডায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কাল কাঠগড়ায় ওঠানো হবে, উকিল মোক্তারের বন্দোবস্ত যেন করি।

আমি ওদের একটু বসতে বলে মুখীকে দিয়ে সুশান্তকে ডেকে পাঠালাম।

সুশান্ত একটা বাড়ির-কাচা পায়জামা পাঞ্জাবি ও রবারের চটি পরে এসে সব শুনল, তারপর কাগজে লিখে নিল।

আমি চুপ করে সোফায় বসেছিলাম।

দারোগাবাবু অসভ্যর মতো আমার দিকে বার বার তাকাচ্ছিলেন।

সুশান্ত বলে, থ্যাঙ্ক য়্যু। এবার আপনারা আসতে পারেন। কাল কোর্টে আমরা জামিনের ব্যবস্থা করব।

দারোগাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে চলে গেলেন।

আমার বুক ফেটে কান্না আসছিল।

রমেন যে আমার স্বামী—। সুশান্তর কাছে সে এমনভাবে রোজ রোজ ছোট না হয়ে গেলে আমার পক্ষে তাকে আবার সম্মান করা সম্ভব হত; সুশান্তও হয়তো খুশি হত। সুশান্ত আমাকে ভালোবাসুক আর না বাসুক এখন ঐ তো আমার একমাত্র বল-ভরসা। একজন অসহায়া অবলা মেয়েকে লোকে যেমন করে দয়া করে, আমাকে ও বুঝি তেমনি করে দয়া করে ভালোবেসেছে; কৃপা করেছে।

লজ্জায় অপমানে আমার মাথা কাটা যেতে লাগল। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল।

সুশান্ত মুখীকে বলল, মুখী তুমি আজ রাতে দিদিমণির কাছে থেকো। তোমার বরকে বোলো বাইরের ঘরে শুয়ে থাকতে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, এখনও চান খাওয়া কিছু হয়নি? কখন হবে?

মুখী ঘর থেকে চলে গেলে সুশান্ত আমার কাছে এসে বলল, কী করবে বলো? কোনো চিন্তা কোরো না। ভালো করে চান করো তো। চান করে ঘুমোও। কাল আমি রমেনবাবুকে ছাড়িয়ে আনব। কোনো ভাবনা নেই।

আমার গলা বন্ধ হয়ে আসছিল, আমি বললাম, আমাকে কী কাল কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে?

সুশান্ত আমার মাথায় হাত রাখল। বলল, পাগলি। তোমায় কেন দাঁড়াতে হবে? তোমার কিছুই করতে হবে না। তুমি যেমন স্কুলে যাও, যাবে। ভালো করে খেয়ে দেয়ে যেও। না খেয়ে যেও না যেন, এই গরমে লু লেগে যাবে। তারপর বলল, রমেনবাবুর জন্যে যা ব্যবস্থা করার তা আমি করব। ওঁর কারখানাতেও তো একবার জানাতে হবে।

আমি বললাম, আমি ফোন করে দেব স্কুল থেকে।

সুশান্ত বলল, তাই দিও, কিন্তু অত বিস্তারিত বোলো না। শুধু বোলো যে ও অফিস যাবে না।

তারপর বলল, কোনো চিন্তা নেই, তুমি স্কুল থেকে ফিরে দুপুরের খাওয়ার সময় তোমার বরকে দেখতে পাবে। হল তো। তারপর বলল, একবার হাসো তো দেখি?

রমেনের জন্যে লজ্জা, অপমান এবং সুশান্তর জন্যে ভালোলাগা সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল আমার মুখে।

আমার মাথায় আর একবার হাত রেখে সুশান্ত বলল, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এবার চান করে খেয়ে নাও। লক্ষ্মী সোনা মেয়ে। যদি আমার কথা না শোনো, তাহলে খুব বকব কিন্তু।

সুশান্ত চলে গেলে দরজা বন্ধ করে বন্ধ দরজায় মুখ রেখেই অনেকক্ষণ ঝর ঝর করে কাঁদলাম।

আমার নড়তে ইচ্ছে করছিল না।

আমার স্বামী আমাকে আর কোন্ কোন্ অসম্মানের সম্মুখীন করাবে জানি না।

রমেনের ওপর রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল।

আর সেই সঙ্গে আমার মন বার বার বলছিল যে অনেক অনেকদিন কেউ আমাকে এমন করে আদরের, বকার, ভয় দেখিয়ে নাইতে খেতে বলেনি। মা মারা যাবার পর কেউই বলেনি।

সুশান্ত! তুমি আমার মরে-যাওয়া মা?

সেদিন রাতে আমি সিরিয়াসলি ভাবছিলাম যে, রমেন সম্বন্ধে কী করা যায়।

কিছুদিন আগে ফ্যাক্টরিতে মদ খেয়ে মাতলামি করে মারধর খেয়ে এল। আজ জুয়াড়িদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হল, কাল কী করবে তা ঐ জানে। আমার আর ওর সঙ্গে এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করে না। গা ঘিনঘিন করে; ঘেন্নাও করে।

অথচ ও যখন অসহায়ের মতো ঘুমিয়ে থাকে, ওর কপালের পাশে চুলগুলো লেপটে থাকে, মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে শিশুর মতো আমার কোমরে বুকে হাত তুলে দেয়, তখন ওকে দেখে মায়া হয়।

এ আমার কপালের দোষ যে, আমি অত সহজে ঠকেছিলাম।

ও আমাকে প্রথম থেকে শেষ অবধি ঠকাবে বলেই মনস্থির করেছিল। ওর মতো মেরুদণ্ডহীন, পরনির্ভর অপদার্থ অথচ চালিয়াৎ ছেলেদের যে কোনো বিবেক বা কর্তব্যজ্ঞান বা আন্তরিকতা থাকে না, তা আমি জানতাম না। ও আন্তরিকভাবে আমাকে ঠকিয়েছিল, জেনেশুনে ও আমার সর্বনাশ করেছিল নিছক আমার শরীরটা চিরদিনের মতো পাওয়ার আশায়।

আমি হয়তো ওর জুয়াখেলার নতুন কোনো পণ ছিলাম। যেমন করে হোক, মিথ্যা কথা বলে, প্রবঞ্চনা করে ও আমাকে জিততে চেয়েছিল। জিততে চেয়েছিল, যেন-তেন-প্রকারেণ।

কিন্তু আমি তো আন্তরিকই ছিলাম। ও যতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে আমার সঙ্গে অভিনয় করেছিল, আমি তার চেয়েও বেশি আন্তরিকতার সঙ্গে ওকে ভালোবেসেছিলাম।

আমার মতো মেয়ে সহজে কাউকে ভালোবাসে না, ভালোবাসতে পারে না; কিন্তু একবার ভালোবেসে ফেললে বহমান ভালোবাসাকে গুটিয়ে ফেলার কোনো ক্ষমতাই যে আমার মধ্যে নেই। আমার পরিণতি, আমার সমস্ত জীবন, সমস্ত ভবিষ্যৎ কি সত্যি সত্যিই রমেনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে? আমি কি সে বাঁধন ছিঁড়তে পারি। সত্যিই কি পারি না?

বাঁধন হয়তো ছিঁড়তে পারি। আইনের পাতায় যে সব প্রতিবিধানের কথা লেখা আছে, সে সব কথা খুব সহজে বলা আছে। করলে খুবই সহজ। কিন্তু যে কথা আইনের বইয়ে লেখা নেই, লেখা থাকে না, তেমন অনেক কথাও তো আছে?

এই সবে আড়াই বছর হল বিয়ে হয়েছে আমার। কত গর্ব, মায়ের সঙ্গে এ নিয়ে কত ঝগড়া, বন্ধুদের সঙ্গে কত মজা, বিয়ের দিন রানির মতো সেজে সিংহাসনে বসা সবই কি এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাব? সেদিন বাড়িসুদ্ধু লোকের মতের ওপর আমার মতের জয় হয়েছিল। সেদিন সিংহাসনে বসে আমি নিজেকে সত্যিই এক দারুণ প্রতাপশালিনী কোনো রানি বলে ভেবেছিলাম—ভেবেছিলাম মুখ-নীচু করা দিদিরা, মা এবং অন্যান্য কাছের লোকেরা আমার কাছ কী নিদারুণভাবে হেরে গেল। আমার মতের কাছে, আমার জেদের কাছে।

সেদিন যে বড় গর্বভরে সকলের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম। নিজেকে বলেছিলাম যে, বাড়িসুদ্ধু সকলে একদিন জানবে, বুঝবে যে আমার বুদ্ধি সকলের চেয়ে বেশি। বলেছিলাম, রমেনের মতো স্মার্ট ছেলে জীবনে খুব উন্নতি করবে। ভেবেছিলাম বেচারা আমাকে বড় ভালোবাসে—আমাকে

পেলে ও জীবনে সম্পূর্ণ হবে, নিজে অনেক বড় হবে। আমার এই গর্ব, আমার এই অল্পবয়সি মেয়ের শরীর ও মনের, আমার আত্মত্যাগের, ওকে বিয়ে করতে গিয়ে আমার লড়াই করতে হল সকলের সঙ্গে এ সব কিছুর যোগ্য সম্মান দেবে ভেবেছিলাম, রমেন; আমাকে!

ভেবেছিলাম ও আমার মুখ রাখবে। ও যে এমন করে আমাকে ধুলোয় ফেলবে কখনও ভাবিনি।

কিন্তু কিছুই তো হল না।

হল না, তবুও আজ আমি একা একা বাড়ি ফিরব কী করে? একা বাড়ি ফিরে আমি কাউকে বলতে পারব না যে বাবা, আমাকে ঠকিয়েছে একটা ঠগ, বাবা আমি একজন অকর্মণ্য কুঁড়ে, জুয়াড়ি মাতালের পাল্লায় পড়েছিলাম। আমি আমার সব খুইয়ে, আমার সুন্দর মনের মধ্যে যা ছিল, আমার নরম প্রথম যৌবনের সুগন্ধি শরীরে যা ছিল, তোমার ব্যাঙ্কে, তোমার সিন্দুকে যা ছিল, দাদাদের যা ছিল, সব খুইয়ে আমি আবার তোমাদের কাছেই ফিরে এসেছি।

কখনও, কোনোদিনও বলতে পারব না, বাবা! রমেন ভালো নয়। বাবা, রমেনের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। বাবা, রমেন একজন মানুষ হিসেবেও মানুষ নয়, পুরুষের কোনো গুণ নেই ওর মধ্যে!

না, না, না। তা আমি বলতে পারব না। ফিরে যেতে পারব না। ফিরে যেতে পারব না আমি। তার চেয়ে এই নরকও আমার ভালো। আরও দেখব। অনেক তো দেখলাম, আরও দেখব। এক এক করে আমার সমস্ত মিষ্টি-দুষ্টু ইচ্ছেগুলো হালকা বেগুনি কোনো চন্দ্রমল্লিকা ফুলের পাপড়ির মতো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলব।

আমার জীবন এখন মরুভূমি হয়ে গেছে। সেখানে শুধুই গরম, তৃষ্ণা, শুধুই কাঁটাঝোপ; বেদুইন ডাকাত। সেখানে ছায়া নেই, শান্তি নেই; স্বস্তি নেই।

তবুও এ আমার ভাগ্য, আমার মনের চাওয়া মায়ের আশীর্বাদ, তাঁর ক্ষমায় মমতার ফুল, আমার একমাত্র মরূদ্যান, আমার ছায়া; আমার ঠান্ডা হাওয়া, আমার মুক্তি · সুশান্ত।

সুশান্ত, ও আমার সুশান্ত, তুমি আমাকে কখনও ছেড়ে যেও না। তোমার কাছে গর্ব করার মতো আমার কিছুই নেই। তুমি সবদিক দিয়ে আমার চেয়ে বড়। তুমি যথার্থ পুরুষ মানুষ। তুমি সভ্য, তুমি সৎ, তুমি নরম এবং তুমি কঠোর।

তুমি আদর করতে জানো, বকতেও জানো, তুমি যাকে ভালোবাসো, তাকে প্রখর তাপ থেকে আড়াল করে রাখতে জানো। তোমার বুকে মুখ রাখলে আমার মনে হবে এ আমার পরম নিশ্চিন্ত স্যাংচুয়ারি। এখানে কোনো শেফালি, কোনো রমেন, রমেনের সহকর্মীর মতো কোনো সেন আমাকে অপমান করতে সাহস পাবে না। তোমার পরিচয়ে শুধু আমি পরিচিত হব—আমার সমস্ত আমিত্ব, আমার সমস্ত গুণ, আমার রূপ সব আমি তোমাকে সমর্পণ করে রিক্ত, নিঃস্ব হয়ে মুক্ত হতে চাই সুশান্ত।

সুশান্ত তুমি আমাকে বাঁচাবে।

আমার সেই আশ্চর্য রাজকীয় নিঃস্বতার নৈবেদ্য তুমি কি প্রসন্নমনে, নিঃশেষে গ্রহণ করবে সুশান্ত?

আমি শুধু খণ্ডমাত্র, অংশমাত্র, আমি অপূর্ণ, অপরিপ্লুত। সুশান্ত, ও সুশান্ত, আপনি কি আমাকে সমগ্রতায় ভরে দেবেন, পরিপূর্ণ করবেন? পরিপ্লুত করবেন? আপনি কি নির্দ্বিধায় আমার সমস্ত শরীর, সমস্ত মনকে অক্লেশে, আনন্দে, আক্ষেপহীনতায় গ্রহণ করবেন?

করবেন কি? সুশান্ত? আপনি?

সুশান্ত। তুমি কী করবে।

৮

আজ কোনো ক্লাস হল না।

মেয়েরা ক্লাসরুম সব সাজিয়েছিল নানারকম ফুল দিয়ে। একটা অ্যাসেমব্লির পর ক্লাস ডিসলভড্ হয়ে গেল।

টিচার্স কমনরুমে আজ সকলে বসে জমিয়ে গল্প করছিলেন। আবার কবে সকলের সঙ্গে দেখা হবে—কতদিন পর।

মিসেস চাহাল স্বামীর কাছে যাবেন বাঙ্গালোরে গরমের ছুটিতে, সেখান থেকে উটিতে বেড়াতে যাবেন। ওঁর চোখ-মুখ আনন্দে ঝক্‌ঝক্ করছিল। ছুটির পর উনি আর ফিরে আসবেন না। বাঙ্গালোরেই কোনো চাকরি দেখে নেবেন। ওখানে ভালো ভালো স্কুল-কলেজ আছে। তাছাড়া মিসেস চাহালের বিদেশি ডিপ্লোমা আছে। ওঁর চাকরি পেতে অসুবিধা হবে না।

আমি তো চাকরি করব ভাবিনি কখনও—যদি কখনও করতাম তো নেহাত স্বাবলম্বনের জন্যে করতাম। নিজের পছন্দমতো শাড়ি কেনার জন্যে বাবা-মাকে বা মেজদাকে কিছু দেওয়ার জন্যে করতাম। কাউকে কিছু দিতে পারলে আমার খুব ভালো লাগে। মেজদা আমার জন্য অনেক কিছু করেছে—আজকালকার দিনে মায়ের পেটের দাদারা সাধারণত এরকম করে না!

আমাকে লেখাপড়া শেখানো, আমার দিকে সবরকম দৃষ্টি রাখা, কীসে আমার ভালো হবে না হবে সেই চিন্তা করা, সবই করেছে। আমার সব দাদাদের মধ্যে মেজদাকে আমি সবচেয়ে ভালোবাসি। মেজদাই জোর করে আমাকে এম-এ ক্লাসে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল। অনেক কাণ্ড করে। কারণ সময় পেরিয়ে গিয়েছিল তখন ভর্তি হবার।

অনেক বন্ধু-বান্ধবদের দাদাদের দেখলাম, তাঁরা নিজেদের চাকরি এবং চাকরির পর বন্ধু-বান্ধব আড্ডা এসব নিয়েই দিন কাটাতেন, তাঁদের বোনেরা কী করছে না করছে, তাদের কিছু অভাব আছে কী নেই, কী তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এ নিয়ে কখনও তাঁরা মাথা ঘামাতেন না। আমার যা হয়েছে, যতটুকু হয়েছে, সবই মেজদার জন্যে। মেজদার ইনিসিয়েটিভে।

চাকরি এখন করছি প্রয়োজন বলে। কিন্তু ভগবানই জানেন, কোনো মেয়েরই প্রয়োজনে পড়ে, দায়ে ঠেকে চাকরি করতে ইচ্ছা করে না। স্বাবলম্বনের জন্যে হয়তো সকলেরই ইচ্ছা করে, কিন্তু চাকরি না করলে যখন চলে না, তখন সেই চাকরি আনন্দজনক নয়।

মিনাদি পানের বাটা খুলে পান খাচ্ছিলেন। পান মুখে পুরে অনেকখানি জরদা ফেললেন মুখে, তারপর হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, তুই কোথায় যাচ্ছিস রে নীরু?

আমি বললাম, আমি আর কোথায় যাব? কোলকাতা যাব একবার। বাবার শরীরটা ভালো না। তাছাড়া মেজদার বিয়ের কথা হচ্ছে। বিয়ে হলে এই ছুটির মধ্যেই হবে হয়তো। তাহলে বিয়েতে মজা করে আসব।

তারপর বললাম, আপনি? আপনি কোথায় যাবেন?

মিনাদি পান খেতে খেতে হাসলেন, বললেন, এখনও বিশ্বাস নেই। তবে আমার হাজবেন্ডের বুড়ো বয়সে পেরেম জেগেছে। বলছে, ছেলেমেয়েদের সবাইকে কোলকাতায় আমার দাদার কাছে রেখে আমাকে নিয়ে একা দার্জিলিং যাবে পনেরো দিনের জন্যে। বলছে মাউন্ট এভারেস্ট কী উইন্ডমিয়ারে উঠবে—হনিমুন করবে না কি আবার। ঢং দ্যাখো না? বলেই, মিনাদি নিজেই হেসে উঠলেন।

মিনাদির কথায় আমরা সকলেই হেসে উঠলাম।

নমিতাদি বললেন, মুখে যাই বলো না কেন, আসলে তুমি খুশিতে ডগমগ মিনাদি। মিনাদি নমিতাদির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, কেন হব না রে খুশি? বর আদর করে, মাথায় করে, নতুন করে হনিমুনে নিয়ে গেলে কার না ভালো লাগে বল? তাছাড়া আমার বরের বাহান্ন বয়স বলে কি ভাবিস বুড়ো হয়ে গেছে? অনেকের চেয়ে জোয়ান আছে।

বলেই, চোখ নাচিয়ে এক দারুণ ভঙ্গি করলেন।

সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

নমিতাদি বললেন, ছেলেমেয়েদের ছেড়ে বেড়াতে যেতে কষ্ট হয় না তোমার?

মিনাদির মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল।

ঢোঁক গিলে বললেন, হয় না বললে মিথ্যা বলা হয়। এখন তো ওরা বেশ বড়ই হয়েছে। কিন্তু বড় হয়ে গেছে বলেই বুঝতে পারি, বুঝতে কষ্ট হলেও বুঝতে পারি যে, ওরা আমার কেউ নয়। আমাদের কেউই নয়। ওরা সব একুশ বছরের অতিথি। ওরা আমাদের জন্যে ভাবে না, ওদের মনে কোনো মায়া দয়া কিছু নেই।

ওদের জন্যে অনেক করেছি, আর কী করব? সবাইকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেব—যাতে যে যার পায়ে দাঁড়াতে পারে। নিজেদের সুখ সম্বন্ধে যখন ওরা এতই সচেতন, তখন নিজের নিজের সুখ নিজেরা দেখে নিক। ওদের জন্যে, ওদের মানুষ করতে তো সারা জীবনই গেল, আর আমাদের জীবনের বাকি আছে কী? এখনও যদি শেষবেলায় একটু আনন্দ না করে নিই, তো কবে করব বল? মেয়ে-জামাই কি ছেলে-বউ কি আমাকে মাথায় করে নিয়ে দেশ দেখিয়ে বেড়াবে? তাদের কাছে বাবা মা তো তখন বোঝা। এই আজকালকার ছেলে-মেয়েদের কাছে কোনো সুখের ভরসা রাখি না।

এ কথার পর সমস্ত টিচার্স রুমে একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল। কেউই কোনো কথা বললেন না। সবাই চুপ করে নিজের ভাবনা ভাবতে লাগলেন।

হঠাৎ আমার মরে-যাওয়া-মা এবং রুগ্‌ণ বাবার কথা মনে হল। মনটা বড় হু-হু করে উঠল।

আমার মা-বাবা মিনাদির মতো ছিলেন না। তাঁরা কিন্তু ছেলে-মেয়েদের মুখ চেয়েই ছিলেন; আছেন। চিরদিন তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে, তারা তাঁদের সুখী করবে, তাঁদের খুশি করবে। সেই প্রজন্ম অন্যরকম ছিল। এ প্রজন্ম একেবারেই অন্যরকম।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম প্রায় বারোটা বাজে।

আমি উঠলাম, সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বাড়ি ফিরেই দেখি রমেন এসে বসে আছে।

শুনলাম, সুশান্ত ওকে পৌঁছে দিয়েই চলে গেছে।

কাল থেকে ও দাড়ি কামায়নি!

খোঁচা খোঁচা দাড়ি হয়েছে রমেনের। যে প্যান্টশার্ট পরেছিল কাল, তাই পরেই আছে।

পা-ছড়িয়ে বসবার ঘরের সোফায় বসে সিগারেট খাচ্ছে। পাশের অ্যাসট্রেতে সিগারেট স্তূপীকৃত হয়ে আছে।

ভেবেছিলাম, আমাকে দেখে ও লজ্জা পাবে। কিন্তু আমাকে দেখেই ও কিছুই হয়নি এমন গলায় বলল, কী ব্যাপার? স্কুল ছুটি হয়ে গেল?

আমিই লজ্জা পেলাম ওর নির্লজ্জতা দেখে।

আমি বললাম, তোমাকে কে বলল?

রমেন উত্তর দিল, সুশান্ত বলল। এখন তো তার কাছ থেকেই আমার তোমার খবর সব জানতে হয়।

আমি চুপ করে রইলাম।

রমেন আবার বলল, তোমাকে আমি বলেছিলাম না যে, আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে বাইরের লোককে ডাকবে না।

আমি জবাব দেবার মতো কিছু ভেবে পেলাম না।

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

আমার বয়স বেশি হয়নি, কিন্তু এ পর্যন্ত মানুষ কম দেখিনি! কিন্তু রমেনের মতো মানুষ হয়, হতে পারে, এ পর্যন্ত আমার ধারণার বাইরে ছিল।

রমেন আবার কৈফিয়ত চাওয়ার গলায় বলল, কী? জবাব দিচ্ছ না যে?

আমি বললাম, ওকে খবর না দিলে কাকে দিতাম? আমাদের জানাশোনা কে আছে ধারে কাছে? ও গিয়ে ছাড়িয়ে না আনলে তো জেলে পচতে।

পচতাম, পচতাম। তাতে তোমার কী? তাতে ওরই বা কী?

এ কথার কোনো জবাব হয় না। তাই এবারেও আমি চুপ করেই রইলাম।

অনেকক্ষণ পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি জুয়া খেলেছিলে কেন?

রমেন আমার মুখের দিকে চোখ মেলে তাকাল।

ওর চেহারাটা সত্যিই সুন্দর। মাঝে মাঝে এখনও ওকে সুন্দর দেখায়। তবে শুধু চেহারার সৌন্দর্যে কেউ তো সত্যিকারের সুন্দর হয় না, যদি না মনের সৌন্দর্য থাকে। তাই ওর ভগবানের দেওয়া সুন্দর মুখে, ওর গড়ে-তোলা অসুন্দর মনের একটা ছাপ কালো-ছায়ার মতো সবসময় লেগে থাকত আজকাল।

ওর দিকে চাইলেই সে ছাপটা আমার চোখে পড়ত।

রমেন বলল, টাকার জন্যে।

টাকা যা পাও সারা মাস কাজ করে, তার ওপর আমি যা পাই তাতে কি আমাদের দুজনের ভদ্রভাবে চলে যাওয়া উচিত নয়? চলে না কি?

সে জন্যে নয়। টাকার দরকার, ধার শোধ করার জন্যে।

কীসের ধার?

তোমার হরি কাকার কাছ থেকে ধার করেছিলাম কিছু টাকা। এখন সেই বুড়ো রোজ তাগাদা দিয়ে চিঠি দিচ্ছে। জামাই-এর সঙ্গে এমন ব্যবহার কেউ করতে পারে যে, তা ভাবতে পারি না।

আমি বললাম, কাকা তাগাদা করছেন তাঁর মেয়ের বিয়ে এসে গেছে বলে! তাছাড়া বিয়ের পর পরই আমাকে না জানিয়ে চোরের মতো আমাদের বাড়ির লোকের কাছে টাকা ধার করতে তোমার সম্মানে বাধল না। ও সরি! তোমার সম্মান বলে কিছু থাকলে তো লাগবে।

রমেন বলল, টাকাটা নিয়েছিলাম তোমারই সুখের জন্যে।

আমার সুখের জন্যে?

হ্যাঁ। এই যে রেফ্রিজারেটরটা দেখছ এ তোমার কাকার কাছ থেকে ধার নেওয়া টাকা। তুমি বিয়ের আগে আগে আমাকে বলতে না, একটা ছোট ছিমছাম দুজনের মতো ফ্রিজ তোমার খুব পছন্দ?

আমি বলতাম, সে তো অনেক কিছুই বলতাম। ছিপছিপে সাদা স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড গাড়ি, আরও কত কী বলতাম! সবচেয়ে বেশি যা চাইতাম তা সৎ, পরিশ্রমী ও ভদ্র স্বামী। তাই যখন হল না, তখন আর অন্য কিছু দিয়ে কী হবে? সে কথা আজ আর বলে লাভ কী? তুমিও অনেক কিছু

আমাকে বলেছিলে, বিয়ের পরই তোমার লিফট্ হবে, তুমি দারুণ ফ্ল্যাট পাবে কোম্পানির, গাড়ি পাবে, কত কী-ই তো তুমি বলেছিলে।

কত মিথ্যা স্বপ্নই তখন দেখেছিলাম। তুমিই দেখিয়েছিলে। অন্য সমস্ত ইচ্ছাগুলোই যখন মিথ্যা হল, তুমি শুধু ফ্রিজটাই সত্যি করতে গেলে কেন। তাও আবার আমারই কাকার কাছ থেকে টাকা ধার করে। ছিঃ ছিঃ আমি ভাবতে পারিনি, তুমি এত ছোট, তুমি আমাকে এমন করে ঠকাবে সবদিক দিয়ে, আমার এমন করে সর্বনাশ করবে তুমি রমেন।

তারপর বললাম, কেন তুমি এমন করলে বলো? আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি, তবে, আমার জীবনটা একটা মস্ত ধাপ্পার মধ্যে দিয়ে এমন করে নষ্ট করে দিলে কেন? বলো, বলো?

আমার কী হল জানি না, আমি ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলাম। অনেকদিন আমি কাঁদি না অমন করে। আমার দেওয়ালে মাথা ঠুকে কাঁদতে ইচ্ছা করল। হয়তো বুকের মধ্যে অনেক কান্না জমে ছিল কোনো উৎসমুখের অপেক্ষায়, যে উৎসে তা উৎসারিত হতে পারে।

আজ আমার কান্না থামতে চাইল না সহজে।

রমেন আমাকে বসে বসে দেখতে লাগল।

আমি ঠোঁট কামড়ে কাঁদছিলাম, যাতে শব্দ না হয়।

রমেন আমাকে দেখে হাসছিল, ওর মুখে একটা অদ্ভুত কুটিল হাসি ফুটে উঠেছিল।

কিছুক্ষণ পর আমি বললাম, তুমি আজই এই ফ্রিজ বিক্রি করে দাও। আজই এ বিক্রি করে সে টাকা নিয়ে কাকার ধার শোধ করো।

রমেন হাসল, বলল, পুরোনো ফ্রিজ কে কিনবে? তাছাড়া বিক্রি হলেও কতই বা দাম পাওয়া যাবে এর। আর বিক্রি করব বললেই তো বিক্রি হবে না। বিক্রি যদি হয়ও তো এখন এক হাজারের বেশি দাম পাওয়া যাবে না।

একটু পরেই রমেন হেসে উঠল একটু চুপ করে থেকে।

বলল, একটা রাস্তা আছে। যে-কোনো দামে এটাকে বিক্রি করা যেতে পারে। এক্ষুনি। আমি এমন একজনকে জানি সে এর জন্যে যে-কোনো দাম দিতেই রাজি আছে।

আমার মাথার মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। আমি বললাম, কে সে?

রমেন অর্থপূর্ণ হাসি হাসল, বলল, সে একজন আছে।

আমি বললাম, হেঁয়ালি অন্য সময় কোরো। তোমাকে এই আমার আলটিমেটাম। আজকের মধ্যে এই ফ্রিজ বিক্রি করে আমার কাকার ধার শোধ করতে হবে তোমার। তোমার লজ্জা করে না? তুমি সর্বক্ষণ স্টেট এক্সপ্রেস সিগারেট খাচ্ছ, কথায় কথায় ট্যাক্সি চড়ো, তোমার ভাব দেখলে মনে হয় তুমি যেন কোথাকার রাজা-মহারাজা!

কিন্তু একবারও মনে পড়ে তোমার যে, এত ধার বাজারে। পৃথিবীর সব লোকের কাছে ধার। এই ধার-করা চালিয়াতি করতে তোমার লজ্জা করে না?

করে না। কখনও করবে না। যারা বোকা, যারা ইডিয়ট তারাই আমাকে ধার দেয়। যারা দেয় তারাও জানে এবং আমিও জানি যে ধার কখনও শোধ হবে না। শোধ যখন দেবই না তখন ও নিয়ে মনোকষ্ট পেয়ে কী লাভ? ধার করি আর যাই-ই করি তোমাকে তো অসুখী রাখিনি?

আমি বললাম, না। পরম সুখে রেখেছ। দু'বেলা ভাত খাওয়ালেই তো সুখ। ধারের টাকায়, জুয়ার টাকায় আমাকে ট্যাক্সি চড়ালে, নটরাজে খাওয়ালেই সুখ। তুমি তো তাই মনে করো। মনে আমার কত যে সুখ তা আমিই জানি।

বলেই, আমি উঠে এলাম বসবার ঘর থেকে। ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমার কিছুই ভালো লাগছিল না।

দুপুরের দিকে রমেন দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে সেজেগুজে কোথায় যেন বেরোল।

ফিরে এল যখন তখন সন্ধে হয়ে গেছে।

এসেই বলল, ফ্রিজটা বিক্রি করে এলাম।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কততে বিক্রি করলে? কার কাছে?

রমেন হাসতে লাগল, হাঃ হাঃ করে। বলল, চার হাজারে। যততে কিনেছিলাম তার দু গুণ দামে। এখনও পৃথিবীতে অনেক গাধা আছে। যারা "পেরেমে" বিশ্বাস করে।

তারপর রমেন বলল, বিয়ের পর থেকে তোমাকে তো কিছুই দিইনি। এবার তোমাকে এই টাকায় একটা গয়না বানিয়ে দেব।

আমি বললাম, কাকার টাকা শোধ দেবে না?

নিশ্চয়ই। শোধ দেবার পর যা থাকবে তাই দিয়ে বানিয়ে দেব।

আমি বসে বসে এলোপাতাড়ি ভাবছিলাম। ভাবছিলাম কার কাছে গিয়ে রমেন এত তাড়াতাড়ি এই পুরোনো ফ্রিজ বিক্রি করে আসতে পারে, আর কে এমন সত্যি সত্যিই বোকা লোক যে এই ফ্রিজ চার হাজার টাকায় কিনল?

ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম পরদিন সকালে।

সুশান্ত একেবারে ভোরেই এসে হাজির এ বাড়িতে। যে পায়জামা পাঞ্জাবি পরে শুয়েছিল, তা পরেই।

এসেই ও রমেনকে একটা খাম দিল। বলল, আপনি যা চেয়েছিলেন। দশ টাকার নোট আছে, চার হাজার। কালই ব্যাঙ্ক থেকে তুললাম।

রমেন বলল, থ্যাঙ্ক য়্যু। আপনি আমার বড় উপকার করলেন। তারপর বলল, ফ্রিজটা পাঠিয়ে দিই এক্ষুনি?

সুশান্ত বলল, না, না, এখানেই থাক না। পরে নিয়ে যাব একসময়। আমার এক বন্ধু একটা ফ্রিজের খোঁজ করছিল, তাকে দেখাব। তার পছন্দ হলে তখন নিয়ে গেলেই হবে।

আর তার পছন্দ না হলে?

বলে রমেন হাসি হাসি মুখ করে তাকাল সুশান্তর দিকে।

সুশান্ত বলল, না হলে পড়েই থাকবে। কখনও হয়তো কারও পছন্দ হবেই। যতদিন না হয় আপনারাই ব্যবহার করুন। আমার তো ফ্রিজ আছেই একটা।

আমি কোনো কথা বললাম না, চুপ করে বসে থাকলাম।

সুশান্ত অস্বস্তি বোধ করছিল, একটু পরই বলল, উঠি!

আমি বললাম, আপনার কত খরচ হল কাল? জামিনে খালাস করার জন্যে রমেনকে?

সুশান্ত বলল, ও কিছু না।

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, কিছু না হলেও এখুনি এই ফ্রিজের টাকা থেকে তা আপনি কেটে নিন।

রমেন বলল, আহা। সুশান্তবাবু যেন আমাদের পর। তুমি এমন ছোটমনের লোকের মতো কথা বলছ কেন নীরু? বলেই খামটাকে রাখল।

আমি অবাক হয়ে রমেনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তারপর সুশান্তকে বললাম, না বলুন, কত খরচ হয়েছে?

সুশান্ত তবু উত্তর দিল না। মুখ নিচু করে রইল।

সুশান্ত বলল, আমি কী আপনাদের পর?

আমার বেশ রাগ হয়ে গিয়েছিল।

বললাম, নিশ্চয়ই। পর ছাড়া আর কী?

সুশান্ত কোনো উত্তর দিল না। বলল, চলি এখন।

রমেন বলল, ওকি বসুন, এত ভোরে এলেন, চা খেয়ে যান এক কাপ।

সুশান্ত বলল, নাঃ, বাড়ি গিয়েই খাব, অফিসের জন্যে তৈরি হই গিয়ে। আজ একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

সুশান্ত চলে যেতেই, রমেন আমার মুখের দিকে তাকাল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। আমার মুখের ভাব বোঝার চেষ্টা করতে লাগল। আমি তা বুঝতে পেরে মুখ তুললাম না।

রমেন বলল, তোমার বড়কাকাকে দু'হাজার টাকা দেব। বাকি দু'হাজার আমার। আমার স্ত্রীর সঙ্গে একজন ক্যাবলা লোককে প্রেম করতে দিচ্ছি তার ট্যাক্স।

আমি চমকে উঠলাম, বললাম, রমেন, মুখ সামলে কথা বলো।

রমেন হাসল। বলল, আমার অভ্যেসই নেই সামলে কথা বলার। তবে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। মিষ্টি মিষ্টি কথা বোলো। বলল, ইতি-উতি চাও তো চাও। কিন্তু বাড়াবাড়ি কোরো না। আমার কাছে একটা স্প্রিং-নাইফ আছে। দু'জনকেই শেষ করে দেব।

আমার চোখ দিয়ে জল বেরোতে লাগল।

আমি বললাম, ছিঃ ছিঃ কী ভাষা তোমার, তোমার কী কাজ? তুমি না ইঞ্জিনিয়র, তুমি না লেখাপড়া শিখেছ, তুমি না আমার স্বামী। তুমি তো এমনিতেই অনেক কষ্ট দিয়েছ আমায়, অনেক অসম্মান করছ প্রতি মুহূর্তে, তবু এ আবার নতুন কী পথ, নতুন কী ছল তোমার মাথায় এল।

আমি মনে মনে বলছিলাম, রমেন, তুমি আমার যা ছিল সব কেড়েছ। আমার বাপের স্নেহছায়ার আশ্রয়, আমার যুবতী শরীরের সব ফুল, আমার অল্পবয়সি মনের সব সাধ। তোমাকে আর কিছু কাড়তে দেব না। আমার নতুন পাওয়া সুশান্তকে আমি কাড়তে দেব না। এটুকু জেনো রমেন, এ জীবনে কেউ কারও প্রতিই এমনি আকৃষ্ট হয় না; যখন কেউ সত্যিকারের আকৃষ্ট হয়। তুমি ছল করেছিলে, তুমি ভণ্ড, জোচ্চোর, তুমি ভালোবাসার কী বুঝবে?...তোমার কাছে এক দিক দিয়ে আমি ঋণী।

ভালোবাসার সস্তা স্মার্ট অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে আজ আমি একটু একটু করে বুঝতে পারি ভালোবাসার মানে কী। কাউকে সত্যিকারের ভালোবাসলে গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে ওঠে। বুঝতে পারি ভালোবাসলে কেউ কাউকে ঠকায় না, ভালোবাসার জনের জন্যে হাসিমুখে সে নিজে ঠকে।

মনে মনে দাঁত চেপে নিজেকে বললাম, তুমি আমার সব কেড়েছ রমেন, তুমি আমার শেষের অবলম্বন সুশান্তকে কাড়তে পারবে না।

আমি বললাম, রমেন আরও ক'টা দিন আমাকে দয়া করো, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে দয়া করো। এখন আমার বাড়ির ফেরার উপায় নেই। এখন ফেরার চেয়ে, বাড়ি ফিরে আমি তোমাকে ছেড়ে এসেছি বলার চেয়ে, আমার আত্মহত্যা করা ভালো। আরও কিছুদিন তোমার সঙ্গে আমাকে থাকতে দাও। রমেন, তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কোরো না। তোমার পায়ে পড়ি রমেন।

রমেন তবুও হাসতে লাগল। বলল, লোককে কষ্ট দিয়ে আমার দারুণ আনন্দ লাগে। বিশেষ করে তোমার মতো কোনো সুন্দরী মেয়েকে। এতদিন জানতাম, তুমি বোকা। আজ দেখছি তোমার চেয়েও বোকা লোক পৃথিবীতে আছে। ভালো। অনেকদিন বাদে একটা ভালো ভালোবাসায় জরজর

মুরগি পাকড়েছি। তোমার সামনে এর পালক ছিঁড়ব আমি এক এক করে। তুমি দেখো। সুশান্ত বোস জানে না, কার ঘরে সে খাপ খুলতে এসেছে।

রমেনের সঙ্গে আমার আর কোনো কথাই বলতে ইচ্ছে করছিল না।

আমি ওঘর ছেড়ে উঠে শোবার ঘরে চলে গেলাম।

রমেন মুখীকে আবার চা দিতে বলে খুক্ খুক্ করে কাশতে কাশতে সিগারেট খেতে লাগল।

একটু পরে রমেন তৈরি হয়ে কারখানায় গেল। যাবার আগে আলমারি খুলে ওর ড্রয়ারে টাকা রাখল। দেখলাম একমুঠো টাকা নিয়ে প্যান্টের হিপ পকেটে গুঁজে নিল যাবার সময়। কত টাকা, তা ওই জানে।

রমেন চলে যেতেই আমি চান করে তৈরি হয়ে নিলাম। তারপর দশটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম।

সুশান্তর অফিসটা বিষ্টুপুরে।

বাস থেকে নেমে খুঁজে খুঁজে জিজ্ঞেস করে করে যেতে যেতে অনেক সময় লাগল।

অফিসটা বিরাট। ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করেছে। সুন্দরী একজন পার্সি মেয়ে রিসেপশনিস্ট বসে আছে রিসেপশনে।

সুশান্তর নাম বলতেই, ও ইন্টারকমে কথা বলল সুশান্তর সঙ্গে, আমার নাম বলল, তারপর বলল, উনি একটু ব্যস্ত আছেন। পনেরো মিনিট যেন আমি বসি, যেন চলে না-যাই।

চলে যাবার জন্যে আমি আসিনি। তাই বসলাম।

আজ রমেন যা বলল, তাতে আমার সত্যিই ভয় করতে লাগল। এখন থেকে সুশান্তর সঙ্গে বাড়িতে দেখা করব না আর। বাড়িতে দেখা করতে বড় ভয় করে—ওর বাড়িও আমাদের বাড়ির কাছে।

তাছাড়া রমেনের পক্ষে আমাদের পিছনে চর লাগানোও অসম্ভব নয়।

আমি আমার জন্যে ভয় পাই না। আমার যা হবার হবে। আমার যা হয়েছে এর চেয়ে বেশি আর কী হবে? কিন্তু আমার জন্যে সুশান্তর যদি কোনো বিপদ ঘটে, তো সে দুঃখ রাখার জায়গা থাকবে না আমার।

কিছুক্ষণ পর একজন সাহেব ও একজন পাঞ্জাবি ভদ্রলোক একটি চেম্বার থেকে বেরোলেন, তাদের পিছন পিছন সুশান্তও বেরোল, বেরিয়ে রিসেপশন অবধি এসে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে ভিতরে গেল।

ঘরের ভিতরে ঢুকতেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। দরজায় ডোরক্লোজার লাগানো ছিল।

একটা সাদা গ্রিলের এয়ারকন্ডিশনার চলছিল ভিতরে।

সুশান্ত একটা চেয়ার টেনে আমাকে দুহাতে ধরে বসাল, তারপর আমার গ্রীবায় আলতো করে একটা চুমু খেল।

আমি লজ্জায়, ভালোলাগায় মরে গেলাম।

সুশান্ত নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল, বসে বলল, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এত তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল, বলার নয়। নিজেই নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

তারপরই বলল, এক মিনিট বোসো, আমি এই চিঠি কটায় একটু সই করে দিই, নইলে ডাক ধরতে পারবে না।

সুশান্ত আমার সামনে বসেছিল। ও মুখ নীচু করে বসে খসখস করে চিঠি সই করছিল। তার আগে একবার করে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল চিঠিগুলোতে।

আজ ও একটা নীলের ওপর সাদা ডোরাকাটা টাই পরেছিল। চওড়া কলারের সাদা শার্ট, মোটা

ফ্রেমের কালো চশমা, সুন্দর টাইয়ের সঙ্গে ম্যাচ-করা নীল কাফলিংকস। সুশান্তকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। এবং খুব বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছিল।

তবে? রমেন যে বলছিল ও বোকা। বলছিল ও পাঁঠা, মুরগি, আরও কত কী বলছিল। সত্যি! রমেন একটা ক্যারেকটার। অন্য কেউ হলে ওকে নিয়ে হাসা যেত। কিন্তু ও যে আমার স্বামী।

টেলিফোনটা বাজল। সুশান্ত ফোনটা তুলল। কার সঙ্গে যেন ইংরিজিতে কথা বলছিল। কোনো কাস্টমার হয়তো কমপ্লেন করছিলেন, তাকে নরম গলায় বোঝাচ্ছিল সুশান্ত, দোষ স্বীকার করছিল; ক্ষমা চাইছিল অন্যায়ের জন্যে।

সেই লাইন কেটে যাবার পরই, ইন্টারনাল বোর্ডের লাইনটা ট্যাপ করে সুশান্ত মিস্টার কাপুর বলে কাকে যেন চাইল। তারপর দেখলাম, সুশান্ত অন্য লোক। দেখলাম ও রমেনের চেয়েও হিংস্র। কিন্তু ওর রাগের ঘোড়ার রাশ ওর নিজের হাতে।

কত ভদ্রভাষায়, আস্তে আস্তে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে কাউকে গালমন্দ করা যায় তা দেখছিলাম। শেষে সুশান্ত বলল, এর পরে যদি এরকম করো তাহলে জানব যে তুমি আমাদের কোম্পানির মতো বাজে কোম্পানিতে চাকরি করতে চাও না।

বলেই ফোনটা ছেড়ে দিল।

ফোন ছেড়ে, চিঠি সই শেষ করে বলল, তারপর? বলো? কী মনে করে? হঠাৎ অফিসে?

আমি বললাম, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলাম।

সুশান্ত হাসল। একটা চারমিনার সিগারেট ধরাল। বলল, তোমার মতন একজন মেয়ের সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে রাজি নই! কোনোদিনও রাজি নই।

আমি শক্ত গলায় বললাম, আপনার কি পয়সা বেশি হয়েছে?

বেশি কথাটা রিলেটিভ। আমার প্রয়োজন যা তার তুলনায় হয়তো বেশিই। কিন্তু তা বলে সস্তা নয়। আমাকে অনেক খেটে রোজগার করতে হয়। বাবা ঠাকুর্দা বা শ্বশুরমশায় কিছু রেখে যাননি আমার জন্য। রেখে গেলেও তা নিতাম না হয়তো। আর কী বলব?

এমনভাবে পয়সা নষ্ট করার কী মানে হয়? রমেনের কথায় আপনি চার হাজার টাকা দিয়ে দিলেন? আপনার তো ফ্রিজ আছেই, তবু কেন এমন করলেন।

সুশান্ত হাসল। বলল, ওটা তো যা-তা ফ্রিজ নয়, ওটা যে নিরুপমার ফ্রিজ। তাই দাম বেশি হবে বইকী।

আমি বললাম, ভালো হচ্ছে না। সবসময় ঠাট্টা ভালো লাগে না।

সুশান্ত গম্ভীর গলায় বলল, ঠাট্টা করছি না নিরুপমা। সত্যি কথাই বলছি।

আমি যা করেছি জেনেই করেছি। তুমি বলো? অন্যায় করেছি?

নিশ্চয় অন্যায় করেছেন। আমি বললাম।

তাহলে করেছি। কী শাস্তি দেবে দাও।

আমি লজ্জা পেলাম, বললাম আমি আবার কী শাস্তি দেব?

হঠাৎ সুশান্ত অন্য স্বরে বলল, নিরুপমা, তুমি এত বোকা কেন?

মানে?

মানে তুমি নিজেকে ভালোবাস না কেন? তুমি নিজের জীবনকে ভালোবাস না কেন? তুমি কি বিশ্বাস করো যে পুনর্জন্ম আছে? পুনর্জন্ম যখন নেই, যখন আমাদের একটাই এবং একইমাত্র জীবন তখন সে জীবনে তোমার নিজের কোনো অধিকার নেই নিজেকে ঠকাবার। তোমার নিজের জন্যেই তোমাকে বাঁচতে হবে। বাঁচার মতো বাঁচতে হবে।

বাঁচতে তো চেয়েছিলাম।

এখন কি মরে গেছ? বাঁচার উপায় কি নেই?

জানি না। হয়তো আছে।

হয়তো নয়। নিশ্চয়ই আছে।

কে বাঁচাবে?

তুমি নিজে বাঁচাবে নিজেকে। অন্য কেউ কি বাঁচাতে পারে? কখনও পারে না। যার বাঁচার, সে নিজে বাঁচে, যার মরার সেও নিজেই মরে।

আমি বললাম, বিশ্বাস করুন! আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

সুশান্ত বলল, অনেক সময় আমারও করে না। কিন্তু সেটা সাময়িক। বাঁচতে হবে বইকী। আমার জন্যে আমার, তোমার জন্যে তোমার। আমাদের সকলেরই বাঁচতে হবে।

আমি বললাম, এসব বড় বড় কথা। আমি আপনাকে সাবধান করে দিতে এসেছি।

সুশান্ত চোখ বড় বড় করে বলল, কী ব্যাপার?

আমি সব বললাম. ও সব শুনে হেসে উঠল হো হো করে। বলল, দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো।

আমি বললাম, আপনার ভয় করছে না?

সুশান্ত উত্তর দিল না। হাসতে লাগল। তারপরই বলল, তুমি কলকাতা যাবে কবে?

আমি বললাম, আমি তাড়াতাড়ি গেলে কি আপনি সুখী হন?

সুশান্ত বলল, হই।

আমি কথা বললাম না।

খারাপ লাগল ওর কথাটা।

ও বলল, দুটি কারণে সুখী হই। প্রথমত, তুমি তোমার বাবার কাছে যাচ্ছ বলে, আর দ্বিতীয়ত, তুমি দূরে গেলে তোমাকে আরও বেশি করে ভালোবাসতে পারব বলে।

আমি হাসলাম। বললাম, কাছে থাকলে বুঝি বেশি করে ভালোবাসা যায় না?

ও বলল, যায়। তবে সেটা হচ্ছে স্থূল ব্যাপার। দূরের ভালোবাসাটা অনেক সূক্ষ্ম।

আমি বললাম, তাই বুঝি?

সুশান্ত আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। ও হঠাৎ বলল, তুমি কি জানো, তোমার প্রভাব আমার ওপর কতখানি—তুমি কি জানো, যে তোমার মতো মেয়ে দেশ ছেঁচে পাওয়া যায় না। তুমি কি কখনও জেনেছ যে তুমি কী?

বললাম, রমেনও কলকাতার স্কাইরুমে বসে এরকম কথা বলেছিল আমাকে। রমেন আমাকে চেয়েছিল। আপনিও কি তাই চান? আপনারা পুরুষরা কি সবাই একরকম? যা চান তা পেয়ে গেলে, আপনাদের তা ধুলোয় ফেলতে, তা মাড়িয়ে যেতে একটুও কি বাধে না?

সুশান্ত হাসছিল। ও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। ওর মুখে কেমন একটা বিষাদ এসে বাসা বাঁধল।

ও বলল, না। রমেন যা চেয়েছিল তোমার কাছে আমি তা চাই না। আমি আসলে কিছুই চাই না; চাওয়ার মতো। আমি যা চাই, তা আমার জন্যে নয়। কেন এবং কী চাই তা তুমি হয়তো একদিন বুঝতে পারবে। যদি না বোঝো, তাহলেও ক্ষতি নেই। তোমার মনে আমার সম্বন্ধে যেরকম খুশি একটা ধারণা করে নেবে।

তার জন্যে দুঃখ নেই। আমার জন্যে ভেব না। আমি আজও তোমার জীবনে কোনো সমস্যা নই; কখনও হব না।

এমন সময় একটা ফোন বাজল।

সুশান্ত বলল, বড়সাহেব ডাকছেন। তুমি বোসো একটু।

আমি বললাম, না। আমি উঠব।

উঠবে? সুশান্ত বলল। তারপর বলল, এখন তো স্কুল ছুটি। মাঝে মাঝে ফোন কোরো সময় পেলে। তোমার যদি মন খারাপ লাগে। বলেই একটা কার্ড দিল সুশান্ত।

ও উঠে দাঁড়াল। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ সুশান্ত আমার ডান হাতের পাতাটা ঠোঁটের কাছে তুলে চুমু খেল। বলল, তোমার মতো সুন্দর হাত আমি কারও দেখিনি।

আমি কিছু বললাম না। বলতে ইচ্ছে হল যে, এ হাতে এমন চুমুও কেউ খায়নি। সকলের সব জিনিস দেখার চোখ থাকে না। ছেলেদের চোখ মেয়েদের হাতের দিকে চাইবার অবকাশ পায় না।

ঘর থেকে বেরিয়ে আমি বললাম, আমি যেজন্যে এসেছিলাম, তা আবার বলে যাই।

সুশান্ত ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বলল, বলো?

আমি বললাম, আপনাকে এমন করে ঠকতে দেব না আমি আর। এতে আপনি কার উপকার করছেন? নিজের অপকার করা ছাড়া এতে লাভ কী?

সুশান্ত বলল, একটা কথা বলব?

আমি দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, বলুন।

ও বলল, আমি তোমাকে যেমন ভালোবাসি, তুমি যদি তেমন করে কোনোদিন কাউকে ভালোবাস, কোনোদিনও; সেদিন জানবে যে, ভালোবাসার জনের জন্য ঠকার সুখ কী এবং কতখানি।

একটু থেমে বলল, চালাক লোকেদের একরকমের আনন্দ, বোকা লোকদের অন্যরকমের। আমি বোকা লোক। আমি বোকাই থাকতে চাই। তুমি যদি কখনো আমার মতো করে কাউকে ভালোবাস, সেদিন আমার কথার মানে বুঝতে পারবে। আজ এ আলোচনা থাক।

বলেই, ও চলে গেল। আমার দিকে হাত তুলল, বলল দেখা হবে।

ওর অফিস থেকে বেরিয়ে আমার মনে হল আমার সব গোলমাল হয়ে গেল।

ও সত্যি সত্যিই চালাক না ভীষণ বোকা এখনও বুঝতে পারলাম না।

কখনও কি বুঝব?

৯

আমি রমেনকে ভালোবাসি না?

যাকে ভালোবেসে এতদিন এত কাণ্ড করেছিলাম, নিজের জেদের জন্যে সকলের অমতে লড়েছিলাম, তার জন্যে কি আমার আর কোনো বোধই অবশিষ্ট নেই? যাকে আমার শরীরের স্বর্গ ও মনের ময়ূর সিংহাসনে তখন সম্মানিত অতিথি হিসেবে এনে বসিয়েছিলাম, তার প্রতি আজ কি আমার কোনো দুর্বলতাই নেই?

জানি না। আমি নিজেকে বুঝতে পারি না। কেউই কি সম্পূর্ণভাবে পারে?

রমেন খারাপ বলে তাকে আজ ত্যাগ করা কি আমার ন্যায় হবে? আমার কি উচিত হবে না যে আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা? রমেন সুস্থ ও স্বাভাবিক না হলে আমার সন্তানের পিতৃত্বের অধিকার ও কোনোদিনও পাবে না। সে অধিকার

আমি মরে গেলেও তাকে দেব না—যতদিন না ও নিজেকে শোধরাচ্ছে। আমাকে নিয়ে ও যা-খুশি করুক—বাঁধা পড়েছি আমি নিজের জালে—নিজের দোষে। কিন্তু আমার অনাগত আমিকে আমার প্রথম যৌবনের সমস্ত দুষ্টু ও মিষ্টি ইচ্ছেগুলোকে আমি নাভিমূলের সঙ্গে সংযুক্ত আমার জরায়ুর মধ্যে সঞ্জাত আমার স্বপ্নের কাউকে আমি রমেনের কদর্যতার শিকার হতে দেব না। আমার মধ্যের অদেখা, অনামা, অননুভূত ছোট্ট আমিটাকেও যদি ও এমন করে কলুষিত করে ফেলে তাহলে কাকে নিয়ে আমি বাঁচব? কোন্ গর্বে ভর করে আমি বেঁচে থাকব তারপর?

রমেন ইচ্ছে করলেই ভালো হতে পারত। ভালো হওয়ার সব উপাদান ওর মধ্যে ছিল, কিন্তু যে একবার ঠগী হয়ে গেছে, ছল-চাতুরী মিথ্যাচার যার মজ্জায় মজ্জায় বাসা বেঁধে গেছে, সে সমস্তরকম ন্যায় ও মেহনতের পথকে ভয় করে। যা সহজে চুরি করে লোকঠকিয়ে পাওয়া যায় তার জন্যে কোন্ বোকা পরিশ্রম করে? রমেন সেই সব চালাক লোকদের দলে পড়ে; যারা এইরকম বোকামিতে বিশ্বাস করে।

রমেন যদি আজ অথবা ভবিষ্যতে কোনোদিনও নিজেকে শুধরে ফেলে, নিজের মধ্যে ঠগীটাকে ঠ্যাঙাড়ের দল দিয়ে নিগৃহীত করায় তাহলে আমি হয়তো রমেনের সঙ্গেই সবচেয়ে সুখে ঘর করব। কারণ রমেনের ভালো হওয়ার সঙ্গে যে আমার জেদ, আমার আত্মসম্মান, আমার সমস্ত অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। রমেনকে নিয়ে সুখী হতে পারলে আমি আর কাউকেই চাই না। এমনকি সুশান্তকেও নয়।

রমেন আজ এমনভাবে আমাকে অপমানিত, বঞ্চিত, ক্ষুব্ধ করেছে বলেই তো সুশান্ত এসে আমার মনের দরজায় দাঁড়িয়েছে। রমেনকে নিয়ে সুখী হলে হয়তো আমার মনে আর কেউ অত সহজে ছায়া ফেলতে পারত না। আমার মন অন্তত দারুণভাবে তাকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করত—এমনভাবে তাকে স্বেচ্ছায় বরণ করত না। আমার সব অশান্তি, সব দ্বন্দ্বর মূলে রমেন। রমেন আমার জীবনের শনি; অথচ ওই আমার বৃহস্পতি, আমার চন্দ্র, আমার বুধ। আমার ওই অমঙ্গল এবং আমার সর্বমঙ্গল।

আজ সকাল থেকেই আকাশে মেঘের আনাগোনা। ঝুরুঝুরু করে একটা হাওয়া বইছে। এতদিন পরে অবশেষে জামশেদপুরে বৃষ্টি হবে।

এই আকাশের মেঘলা ঠান্ডা মিষ্টি হাওয়ায় মনটা কেমন উদাস উদাস লাগে। সকাল থেকেই কেমন কুঁড়েমি লাগছিল। কিছুই করতে ভালো লাগছিল না।

রমেন কারখানায় চলে গেছে অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ গড়িমসি করে প্রায় বারোটা নাগাদ চান করতে গেলাম। অনেকক্ষণ ধরে চান করলাম আজকে। মাঝে মাঝে আমার নিজেকে পরীর মতো পরিষ্কার করতে ইচ্ছে করে। পবিত্র করতে ইচ্ছে যায় সমস্ত শরীর, কুমারী মেয়েদের মতো। কিন্তু আমি তো আর কুমারী হতে পারব না।

চান করে উঠে জামাকাপড় পরে কী করব কী করব ভাবছি, এমন সময় দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল।

দরজা খুলে দেখি সুশান্ত। ওকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। ভালো লেগেছিল খুব। বলেছিলাম, আপনি? অসময়ে?

সুশান্ত লজ্জা পেয়েছিল। বলেছিল, এই খেতে এসেছিলাম বাড়িতে, ভাবলাম, দেখে যাই তুমি কী করছ?

আমি বললাম, বসুন।

সুশান্ত সোফায় বসেছিল। বসেই বলেছিল, তুমি আমার সামনে এসে বোসো। তোমাকে একটু ভালো করে দেখি।

আমি বলেছিলাম, আমি কি দেখার মতো? দেখে কি আশ মেটেনি?

—দেখার মতো কিনা সে তো যে দেখবে সে বুঝবে। আর আশ কী অত সহজে মেটে?

আমি কথা না বলে ওর সামনে এসে বসেছিলাম।

ও একদৃষ্টে আমার চোখের দিকে চেয়েছিল, তার দু'চোখের মণিতে কী যেন খুঁজছিল। ওর কী যেন হারিয়ে গিয়েছিল—এমনভাবে ও চাইছিল আমার চোখে, যেন কোনো হারানো জিনিস ও খুঁজে পাবে।

আমি কথা বলছিলাম না কোনো। অবাক হয়ে সুশান্তর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সুশান্ত একটা ব্রাউন রঙের সুট পরেছিল।

হঠাৎ সুশান্ত বলেছিল, নিরুপমা, তুমি আমাকে পছন্দ করো?

আমি একটুক্ষণ চুপ করে ছিলাম।

ও বলেছিল, কি পছন্দ করো না, না?

আমি চোখ তুলে বলেছিলাম, আপনি জানেন না?

ও অবুঝের মতো বলেছিল, আমি জানি না। জানলেও আমি তোমার নিজের মুখ থেকে শুনতে চাই!

আমি ওর চোখের দিকে চেয়ে বলেছিলাম, করি। খু-উ-ব করি।

তারপর ও বলল, তুমি আমার জন্যে রমেনবাবুকে ছাড়তে পারো? পারো নীরু?

আমি চুপ করে ছিলাম। অনেকক্ষণ কথা বলিনি কোনো।

সুশান্ত অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে ছিল। যেন, কথাটা বলে খুব অপরাধ করেছে!

অনেকক্ষণ পর আমি বলেছিলাম, আমাকে একটু সময় দিন। আপনি আমাকে বুঝুন একটু। আপনি.....।

সুশান্ত আমার কাছে উঠে এসেছিল, এসে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে ওর বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল। আমার ভীরু বুক ওর সবল ঋজু বুকে লুকিয়ে ছিল। আমার খুব জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছিল।

আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আমার সিঁথিতে ওর থুতনি রেখে সুশান্ত বলেছিল, আমি জানতাম নীরু, আমি জানতাম। তুমি মানুষটা বড় নরম। বড় ভালো মেয়ে তুমি। তুমি কাউকে কষ্ট দিতে পারো না, কষ্ট দিতে চাও না, তাই তো সমস্ত কষ্ট তোমার নিজেকে একা বইতে হয়। তোমাকে আমি সম্মান করি। তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ভালোবাসি বলেই বলছি, কখনও এমন কিছু কোরো না যাতে তোমার মন সম্পূর্ণভাবে সায় না দেয়। আমি তোমার মন বুঝি। কি? বুঝি না আমি?

তারপর একটু থেমে, আমার ঠোঁটে ওর নিজের ঠোঁট চেপে ধরে অনেকক্ষণ আমাকে আদর করল সুশান্ত। আমার মনে হচ্ছিল আমি এক্ষুনি ভেঙে পড়ব, নিজেকে সামলাতে পারব না বুঝি। ছিঃ ছিঃ সে বড় লজ্জার হবে। মরে গেলেও আমি সুশান্তকে বলতে পারব না যে, তোমার আদর আমার ভালো লাগছে। সুশান্তর ছোঁওয়া আমাকে এক মুহূর্তের মধ্যে পাগল করে তোলে—অথচ রমেন কাছে এলে আমার শরীর আড়ষ্ট হয়ে যায় আজকাল। সুশান্তর মধ্যে কী আছে, আমি জানি না।

হঠাৎ সুশান্ত বলল, নিরুপমা, তোমাকে তোমার সম্পূর্ণতায় দেখতে চাই। এরকম টুকরো টুকরো তোমাকে নয়। তোমার অনাবৃত অখণ্ড তুমিকে। কি? আপত্তি? আমার প্রার্থনায় আপত্তি?

আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। লজ্জায়; আবার ভালোলাগাতেও।

সুশান্ত আবার বলল, কি? দেখতে দেবে না? দেখাবে না?

আমি মুখ নীচু করে বললাম, ঐ সব ভালো না। আমার ইচ্ছা করে না। আমার ভীষণ লজ্জা করে। আমার কী আছে দেখাবার মতো?

সুশান্ত বলল, আমার কিন্তু খুব ভালো লাগত। আমি কিন্তু খুব খুশি হতাম। আমাকে খুশি দেখতে চাও না তুমি?

আমি সুশান্তর মুখে আমার ডান হাতের আঙুল চাপা দিয়ে বললাম, চাই; চাই।

আমার মন বলল, তোমাকে আমি সবসময় খুশি দেখতে চাই সুশান্ত। তুমি অমন করে বোলো না।

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বললাম, শুধু দেখাই কিন্তু। আর কিছু না। ঠিক তো?

সুশান্ত আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেই বলল, বেশ। শুধুই দেখা। তুমি দেখো; আর কিছুই না। তারপর বলল, নিরুপমা, তুমি আমাকে ভরসা করতে পারো। জোর করে কিছু পাওয়ায় কখনও আমি বিশ্বাস করিনি। তোমার যা ইচ্ছা করে না তা আমি কখনও চাইব না। সেই ইচ্ছাবিরুদ্ধ পাওয়ার দাম অন্যদের কাছে কী জানি না, কিন্তু আমার কাছে সে পাওয়া সম্পূর্ণ মূল্যহীন।

আমি বললাম, আপনি দাঁড়ান এখানে। আমি শোবার ঘরে যাচ্ছি।

সুশান্ত শুনল না। আমার সঙ্গে সঙ্গে শোবার ঘরে এল।

তারপর আমাকে নিজহাতে পরম যত্নে অনাবৃত করল।

আমার দু বুকে চুমু খেয়ে সুশান্ত বলল, তুমি কী সুন্দর নিরুপমা। তুমি কী দারুণ সুন্দর।

শাড়ি আমি খুলে ফেলেছিলাম। সুশান্ত শায়াটাকে টেনে নামাতে যেতেই আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। আমি চোখ বন্ধ করেই বললাম, আমি খুলে দিচ্ছি। বলে চোখ বন্ধ অবস্থাতেই শায়াটা টেনে নামালাম আমি।

কিছুক্ষণ পর সুশান্ত আমার নাভিতে চুমু খেল। তারপর নাভির নীচে।

আমি দু পা জোড়া করে শুয়েছিলাম। পুরুষজাতটাকে বিশ্বাস নেই। এমনকি সুশান্তকেও না।

কিন্তু সুশান্ত কথার খেলাপ করেনি কোনোরকম। আশ্চর্য!

ও শুধু বলতে লাগল, নিরুপমা, আমি জীবনে কখনও কোনো অনাবৃত যুবতীকে দেখিনি। বিশেষ করে, যাকে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে তাকে। তুমি কী সুন্দর নিরুপমা! তোমাকে প্রথম দিন দেখার পর থেকেই তোমার শরীর সম্বন্ধে একটা কল্পনা করতাম। তুমি জানো না, কতদিন তোমাকে তোমার নগ্নতার স্বপ্ন দেখেছি। সত্যি বলছি কত দিন। আমি তো ভগবান নই নিরুপমা, আমিও তোমারই মতো রক্তমাংসের একজন মানুষ। একজন অতি সাধারণ মানুষ। কিন্তু বিশ্বাস করো, তুমি আমার সেই সুগন্ধি স্বপ্নের চেয়েও সুন্দর—তোমার সবই সুন্দর নিরুপমা। নিরুপমা, নিরুপমা, বলতে বলতে সুশান্ত আমার সমস্ত শরীরে চুমু খেতে লাগল।

আমার শরীরটাকে আমার বড় ভয়। ভয় হল, আমি নিজে যদি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসি। আমি তো সুশান্তর মতো সংযমী নই।

আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, আর না সুশান্ত, আর না। আজকে আর না। উঠুন, প্লিজ উঠুন।

সুশান্ত লক্ষ্মী ছেলের মতো সরে গেল।

আমি বললাম, বসবার ঘরে যান, আমি আসছি।

ও বসবার ঘরে চলে গেলে আমি জামাকাপড় পরে ড্রেসিং টেবলের সামনে চুলটা টিপটা ঠিক করে নিয়ে ওঘরে গেলাম। সুশান্ত একটা ঘোরের মধ্যে বসেছিল। আমাকে দেখামাত্রই বলতে লাগল, কী সুন্দর, তুমি কী সুন্দর! তারপর আমার হাতটা ওর হাতে নিয়ে বলল, ছোটোবেলা থেকে আজ অবধি এত সুন্দর কিছু আমি দেখিনি। সত্যি নিরুপমা।

আমি হাসলাম। বললাম, আপনি অনভিজ্ঞ তাই এ কথা বলছেন। যে-কোনো মেয়েই এমন সুন্দর। সব মেয়ের শরীরই একরকম। আমার কী এমন বিশেষ কিছু আছে, যা অন্যদের নেই? আপনি কখনও কাউকে এমনভাবে দেখেননি তাই বলছেন।

তারপর সুশান্তর থুতনি ধরে নেড়ে বললাম, বোকা কোথাকার। এত বয়স হয়েছে এখন পর্যন্ত কচি খোকা—কিছুই জানেননি, কিছুই দেখেননি।

সুশান্ত তখনও সেই ঘোরের মধ্যে বসেছিল। ও ঘোরের মধ্যে থেকেই হাসল। বলল, ভাগ্যিস বোকা ছিলাম, নইলে আজ কী নিরুপমাকে দেখতে পেতাম! জানো নীরু, আমার নজরটা চিরদিনই উঁচু—এর জন্যে আমি চিরদিন গর্বিত! আজ আমি ভগবানে বিশ্বাস করলাম। যিনি ফুল গড়েন, প্রজাপতি গড়েন, হলুদ-বসন্ত পাখি গড়েন, তুমি তাঁরই হাতের গড়া। তুমিও তো একটা পাখি। একটা দারুণ পাখি নীরু। আজ আমি সত্যিই প্রাপ্তবয়স্ক হলাম।

আমি হাসলাম। বললাম, বকে গেলেন বলুন। আমিই বকিয়ে দিলাম আপনাকে।

সুশান্ত হাসল। বলল, জীবনে এক বিশেষ ক্ষেত্রে আমি কিশোর ছিলাম। তুমি আজকে আমাকে যুবক করলে। নিরুপমার দয়ায় আজ আমি নিরুপম হলাম।

একটু চুপ করে থেকে সুশান্ত বলল, তুমি একদিন তোমার সম্পূর্ণ তুমিকে দিয়ে দেবে আমায়? একটুও বাকি না রেখে? কোনো দারুণ ক্লারিওনেটের মতো তোমাকে আমি খুশিমতো বাজাব। সেদিন শুধু দেখা নয়—যা আমার মন চাইবে, যা আমার শরীর চাইবে তা-ই করব। দেবে? সেদিন তুমিও আমাকে আমার চাওয়ার মতোই তীব্রতায় চাইবে তো? ঠকাবে না, ফাঁকি দেবে না আমাকে?

আমি কুঁকড়ে গেলাম। বললাম, আমার ওসব ভালো লাগে না। বিশ্বাস করুন, ইচ্ছা করে না! আপনি কি কখনও আমাকে জোর করবেন?

সুশান্ত খুব আশাভঙ্গতার চোখে তাকাল আমার দিকে।

তারপর বলল, না। কখনও না। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ইচ্ছাই খাটাব না আমি। তুমি দেখবে, তোমার সব ইচ্ছার দাম আমি কেমন করে দিই। একদিন তুমি দেখতে পাবে।

তারপর হঠাৎ সুশান্ত বলল, নিরুপমা, আমাকে অন্য দশজন পুরুষ বলে ভাবলে ভুল করবে। আমি বলছি না যে অন্যদের চেয়ে আমি ভালো, শুধু বলছি যে, আমি অন্য রকম। আমাকে তুমি কখনও ভুল বুঝো না।

আমি বললাম, আমি জানি সুশান্ত। আমি জানি আপনি কী! আমি যা দিতে পারি না তা চেয়ে আপনি আমাকে কখনও দুঃখ দেবেন না। যখন সময় হবে, যদি হয়, তাহলে আপনা থেকেই দেব, আপনার চাইতে হবে না কিছু আমার কাছে। আপনি কিছু চাইলেন অথচ আমি দিতে পারলাম না এ কথা ভাবতেই আমার ভীষণ খারাপ লাগবে।

তারপর একসময় আমার কপালে চুমু খেয়ে সুশান্ত চলে গিয়েছিল।

ঠিক সেদিনই রাতে এক দারুণ ঘটনা ঘটল। রমেন কারখানা থেকে ফিরে চানটান করে বসবার ঘরে সোফায় বসেছিল। রমেনের মুখে ওর চিরাচরিত দুর্বিনীত অসভ্য ঔদ্ধত্যের বদলে কেমন যেন একটা অসহায়তা ছিল। এমন অসহায়তা আমি কখনও দেখিনি ওর মুখে আগে।

ইদানীং ওর সঙ্গে আমি বড় একটা কথা বলি না প্রয়োজন ছাড়া। কথা বলতে ইচ্ছাও করে না। তবু শোবার ঘরের খাটে বসে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বসবার ঘরের দরজার মধ্যে দিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে কী একটা দারুণ কষ্টে আমার বুক ভরে গেল। আমার মন বলতে লাগল, এই হতভাগা লোকটার আমি ছাড়া কেউ নেই। পৃথিবীর আর সকলেই ওকে দূর-ছাই করে। আমিও ওকে ত্যাগ করলে ওর কী হবে ভাবতে পারি না আমি। তাছাড়া ওর আজকের এই হঠাৎ—অসহায়তা

দেখে আমার মন বলতে লাগল, সে সুশান্তর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ও কোনো সিকসথ্ সেন্সে আঁচ করতে পেরেছে? আমার খুব ভয় হল যে, ও কি জেনে গেছে যে আজ দুপুরে সুশান্ত এখানে এসেছিল? সুশান্ত আজ এমন কিছু দেখে গেছে, ওর অনভিজ্ঞ রোমাঞ্চিত আঙুলে স্পর্শ করে গেছে, যা এতদিন রমেনের একারই ছিল। একমাত্র রমেনের।

জানি না। ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার মনের মধ্যে কে যেন ছিঃ ছিঃ করে উঠল। কে যেন বলে উঠল, তুমি খুব খারাপ হয়ে গেছ নীরু। তুমি কী খারাপ হয়ে গেছ?

চুল বাঁধা সেরে আমি বসবার ঘরে গেলাম। তারপর ক্যাজুয়ালি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি চা খাবে?

রমেন মুখ নামিয়েই ছিল। মুখ না তুলেই বলল, নাঃ।

আমি বললাম, তোমার কী হয়েছে?

আমার মন যত নরম করে, যত দরদভরে এ কথাটা শুধোতে চাইল, মুখ তেমন করে শুধোল না। মনের উষ্ণতা মুখের কথায় প্রতিফলিত হল না।

আমার নিজের ওপর খুব রাগ হল। মন যা বলতে চায়, মুখ তা অকপটে বলে না কেন? এই বাধা কোথা থেকে আসে? ভেবে পেলাম না।

আমি এবার ওর কাছে গিয়ে বসলাম, বললাম তোমার মন খারাপ? কেন? কী হয়েছে বলবে না আমাকে?

রমেন কোনো কথা না বলে ওর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে আমার হাতে রাখল।

আমি মুখ তুলে দেখলাম ওর দু'চোখ জলে ভরা।

আমার বুকের মধ্যে কে যেন একশো ছুঁচ ফুটিয়ে দিল এক সঙ্গে।

আমি ওর আরও কাছে সরে গিয়ে বললাম, কী হয়েছে রমু, তোমার কী হয়েছে আমাকে বলো।

রমু বলে ডেকে, আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। কত দিন; কত দিন যে ওকে এ নামে ডাকিনি! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে রমেনের একটা আদরের নাম ছিল। আমারই দেওয়া।

রমেন খুব আস্তে আস্তে বলল, আমি তোমাকে খুব কষ্ট দিই, না নীরু?

আমি ওর চোখে জল দেখে নিজেকে সামলাতে পারলাম না, ওর প্রতি আমার কঠোর না হওয়ার কোনো কারণ ছিল না; কিন্তু আমি ওর প্রতি কঠোর থাকতে পারলাম না। আমার নিজের দু'চোখও কেন জানি না জলে ভরে গেল। ওর বিরুদ্ধে আমার পুঞ্জীভূত সমস্ত অভিযোগ আমি সেই মুহূর্তে ভুলে গেলাম।

আমি বললাম, কষ্ট কীসের? আমার তো কোনো কষ্ট নেই।

তারপর গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললাম, আমার নিজের জন্যে কোনো কষ্টই নেই। যতটুকু কষ্ট তা তোমার জন্যে, তোমাকে দেখে। তুমি এরকম হয়ে গেলে কেন?

রমেন বলল, আমার দোষ। আমারই দোষ নীরু। তোমাকে আমি যেমন করে রাখতে চেয়েছিলাম তেমন করে রাখতে যে পারিনি, পারি না যে, সেটা কী আমার কম দুঃখ। আমি নিজেও কী শালা জানি, কেন আমি এরকম হয়ে গেলাম? তোমার হয়তো মনে আছে যেদিন তুমি আমাদের ফ্যাক্টরিতে গিয়েছিলে সেদিন আমি মাতাল হয়ে মারামারি করে এসেছিলাম। তুমি আমাকে মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরতে দেখেছিল, আমি বমি করেছিলাম, কামীনদের সঙ্গে নোংরামি করেছিলাম। কিন্তু কেন তা করেছিলাম তুমি কখনও ভাবোনি। ভাবার প্রয়োজনও বোধ করোনি।

আমি বললাম, না। সত্যিই ভাবিনি। তুমি বলো, কেন করেছিলে? আমাকে বলো!

রমেন বলল, তোমাকে সেদিন ওখানে নিয়ে গিয়ে তোমাকে যে কতখানি অপমান করেছিলাম তা তুমি যখন সেনের সঙ্গে মোটর সাইকেলে করে চলে গেলে সেই মুহূর্তেই বুঝতে পেরেছিলাম।

দুঃখে রাগে আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছিল। আমি ভেবে পাইনি কী করে সে দুঃখ ভোলা যায়। তাই অমন করেছিলাম। আমি জানি যে, তুমি বলবে যে ওরকম করে কোনো দুঃখই ভোলা যায় না। কিন্তু আমি আর কী করব তখন ভেবে পাইনি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে রমেন বলল, চল নীরু, আমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাই। বিয়ের আগে তোমাকে যা যা বলেছিলাম, মানে আমার সম্বন্ধে, তার এক বর্ণও মিথ্যা ছিল না। কিন্তু বিয়ের পর সেই কোম্পানির ইউনিয়নের কর্তার এক লোক মালিকের ইচ্ছানুযায়ী এসে রাতারাতি আমার ওপরের পদে বহাল হল। আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ সেদিন শালা পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল। তাই সে চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। তোমাকে এত কথা তখন বলিনি, কারণ বললেও তুমি হয়তো বিশ্বাস করতে না। আমি জানতাম, আমার কথাগুলোর ওপর তোমার ছেলেমানুষ মন কতখানি ভরসা করেছিল। আমি আমার নিজের কেস সমর্থন করে সেদিন এবং তার পরেও কখনও কোনো কথা বলিনি। আমি তোমার আত্মীয়স্বজন তোমার যারা প্রিয়জন তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে সবরকমভাবে চেষ্টা করেছিলাম যাতে তোমার মন আমার থেকে সরে যায়। তুমি জানো না নীরু, তুমি আমার কত আদরের। আমার কারণে তোমার এই কষ্ট আমার দেখতে ভালো লাগে না আর। অথচ উপায় নেই কোনো।

আমি বললাম, কোনোই কি উপায় নেই?

আমার কানে ওর বারবার উচ্চারিত 'শালা' কথাটা বাজছিল।

এ দেশে আমি আর থাকব না নীরু। এখানে সহায়সম্বলহীন মামা-মেসোহীন বাঙালি ছেলেদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। চোরে বদমাইসে দেশটা ভরে গেছে। খুঁটির জোর ছাড়া এখানে কিছু করার নেই। প্রথম আমি একা চলে যাব। তারপর ওখানে ভালো করে সেট্‌ল্ করে তোমাকে নিয়ে যাব। যে করে হোক আমার পাঁচ-সাত হাজার টাকার দরকার। দরকার হলে চুরিও করতে হবে।

আমার খুব খারাপ লাগল।

বললাম, চুরি করতে হবে কেন? আমার সেভিংস অ্যাকাউন্টে হাজার তিনেক টাকা হবে আর আমার গয়না বন্ধক দেব বা বিক্রি করব। তুমি যদি মনস্থির করেই থাকো, তাহলে তুমি যা বলছ তাই-ই হবে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে আমি বললাম, বিশ্বাস করো, এরকম গ্লানির জীবন ভালো লাগে না। তুমি জামশেদপুরে চাকরি নিয়ে এলে বলেই আমি এলাম। কলকাতায় যে স্কুলে ছিলাম তাতে আমার মাইনে অনেক বেশি ছিল। এখনও সবিতাদি আমাকে ফিরে আসতে বলেন সব সময়। বলেন, উনি আমাকে খুব মিস্ করেন। তুমি যতদিন না আমাকে নিয়ে যাও সেখানে, ততদিন বাবার কাছেই থাকব। বাবাকেও দেখাশুনা করতে পারব। আমি তো আর দাদাদের ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকব না, নিজের রোজগারেই নিজে থাকব। অবশ্য দাদারা টাকা না দিলেও কিছুই মনে করবেন না, বরং ভালোবেসেই রাখবেন। তবু তোমার সম্মানের জন্যেই টাকা দেব আমি। বিয়ের আগে এক রকম থাকে, বিয়ের পরে মেয়েদের সম্মানটা তাদের স্বামীর সম্মানের সঙ্গে যে কতখানি জড়ানো থাকে তা আশা করি তুমি বুঝতে পারো; বোঝো।

রমেন চিন্তিত মুখে বলল, বুঝি, সবই বুঝি। তারপর হঠাৎ বলল, গয়না তো তুমি বাড়িতে রাখোনি? লকারে রেখেছ না? লকারের চাবি তোমার কাছে?

আমি বললাম, আছে। টাকাটা তোমার কবে দরকার?

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। অসুবিধা না হলে কালই। জব ভাউচার আমি ইতিমধ্যেই জোগাড় করে ফেলেছি। পাসপোর্ট আমার করাই আছে। টাকাটা পেলে কলকাতায় গিয়ে কালই প্যাসেজ বুক করব।

ভিসা-করে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

আমি বললাম, কই? জব ভাউচারের কথা তো তুমি আগে কখনও বলোনি? পাসপোর্টের কথাও না।

রমেন বলল, তুমি শুনতে চাইলে তো বলব। তারপরই মুখ ঘুরিয়ে বলল, কেন? তুমি কি আমাকে সন্দেহ করো?

আমি লজ্জিত হলাম। বললাম, ওরকম করে বলছ কেন?

না। সন্দেহ করছ, তাই বললাম।

আমি বললাম, তুমি কলকাতা গেলে তো আমিও তোমার সঙ্গে যেতে পারি। আমার তো স্কুল বন্ধই হয়ে গেছে। আমি তো এমনিতেই যেতাম। কতদিন বাবাকে দেখি না।

রমেন বলল, বাড়ি ফাঁকা রেখে দু'জনে একসঙ্গে যাওয়া কি ঠিক হবে? আমি প্যাসেজ-ট্যাসেজ ঠিকঠাক করে ফিরে আসব, তারপর এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এখানকার পাট-চুকিয়ে একেবারে ফিরে যাব। একসঙ্গে যাব দু'জনে কলকাতা তখন। একটা দিন তুমি এখানে থাকো। কেমন?

আমি বললাম, বেশ! তুমি যা বলবে।

রাতে শোবার ঘরের আলো নিবিয়ে যখন রমেনের পাশে শুলাম তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। বাইরে জ্যোৎস্না ফুট্‌ফুট্ করছে। জ্যোৎস্নার একটা বড় ফালি এসে পড়েছে বিছানার ওপর।

রমেন পায়জামা পরে খালি গায়ে শুয়েছিল। অনেক অনেকদিন পর আমি ভালোবেসে নিজের থেকে রমেনের বুকে হাত রাখলাম। আমি খাওয়ার আগে ভালো করে গা ধুয়েছিলাম। সারা গায়ে পাউডার মেখেছিলাম। কেন জানি না, রমেনের কথা ভেবে মনটা খারাপ লাগছিল। সত্যিই যদি ও মনে করে এ দেশে ওর জন্যে কোনো ওপেনিং নেই, তাহলে যাকই না অন্য দেশে। বেচারা! আমি হয়তো সত্যিই ওকে কখনও বুঝিনি।

আমি বললাম, রমু বাবু, মুখটা এদিকে ফেরান।

রমেন পাশ ফিরে শুয়ে আমাকে জড়িয়ে রইল।

আমি ওর বুকের চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললাম, কতদিন—কতদিন পরে তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে বলে মনে করো?

রমেন বলল, তিন-চার মাস। তার মধ্যেই চাকরি ও অ্যাপার্টমেন্ট দেখে নেব। ওখানে ছোটো গাড়ি কেনারও অসুবিধা নেই। তবে বেশ ঠান্ডা জায়গা।

আমি বললাম ক্যানাডাতেই যাবে বলে ঠিক করেছ?

ও বলল, জব-ভাউচার তো ওখানেরই। মনট্রিল-এর একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে।

ওখানে টিচিং লাইনে আমিও তো কোনো কোর্স করে নিতে পারব? কি? পারব না?

রমেন বলল, নিশ্চয়ই পারবে।

আমার ভাবতে ভালো লাগছে। তুমি একটু গুছিয়ে নিলে আমরা আমাদের নিজেদের গাড়িতে কিন্তু বেড়াতে বেরোবো। আমাকে নায়গ্রা ফলস্ দেখাবে তো?

রমেন আমাকে চুমু খেয়ে বলল, সব দেখাব।

এইটুকু বলেই রমেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। আমাকে ছেড়ে দিল।

কলকাতা থেকে ফিরবে কবে?

কিছুদিনের মধ্যেই ফিরতে পারব বলে মনে করি।

বাবার সঙ্গে দেখা কোরো কিন্তু। বাবাকে বোলো যে আমি যাবার সময় বাবার জন্যে আম নিয়ে যাব।

রমেন বলল, বলব।

আমি একটু পরে বললাম, ও মা, সরি! তোমার তো উঠতেও হবে আমাদের বাড়িতেই। ওখানে তো তোমার ওঠার কোনো জায়গাই নেই এখন।

তোমাদের বাড়িতে আবার কী উঠব? কোনো হোটেলে-টোটেলে থাকব। কয়েকটা তো দিন আর রাত।

থাকলেই পারতে। এতদিন পরে কলকাতা যাচ্ছ, বাবা কি দাদারা কি অখুশি হতেন?

—না। তা না। আমার ভালো লাগে না।

বললাম, যা ভালো মনে করো।

আমার চুপ করে শুয়ে থাকতে ভাবতে খুব ভালো লাগছিল। আমার স্বামীর নিজের অ্যাপার্টমেন্ট। কত তলায় হবে কে জানে? বেশ একটা টেরাস্ থাকবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিচেন, সঙ্গে ছোট প্যান্ট্রি, গ্যাস তো থাকবেই, একটা ইলেকট্রিক কুকিং রেঞ্জও নিশ্চয় থাকবে। এখানে তো আর চাকর রাখা যাবে না। সব কাজ নিজেদেরই করতে হবে। রমেন যা কুঁড়ে ও তো ঘরের কাজ কিছুই করবে না। ভাবতে ভালো লাগছিল, তারপর একসময় আমাদের একটি বাচ্চা হবে। ততদিনে আমার পড়াশোনা শেষ করে ফেলব। তখন চাকরিও ছেড়ে দেব। সব সময় বাচ্চাকে দেখাশোনা করব। সেটাই তখন আমার একমাত্র কাজ হবে। সব, সব, এ সমস্ত কিছু আমার ভাবতে ভীষণ ভালো লাগছিল।

কিন্তু তারপরই একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। রমেন যখন আমাকে আদর করছিল, চরম আদর; ঠিক সেই সময় আমার চোখের সামনে থেকে রমেনের মুখটা অদৃশ্য হয়ে গিয়ে সেখানে সুশান্তর মুখটা ভেসে উঠল। আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। সেই মুহূর্তে সেই বন্ধ চোখের অন্ধকারে ভেসে আমি সুশান্তকে সব কিছু দিয়ে দিলাম—একজন মেয়ে কোনো পুরুষকে ভালোবেসে তাকে তার সবচেয়ে যা দামী দান দিতে পারে, তাই-ই দিয়ে দিলাম।

রমেন ক্লান্তিতে, ভালোলাগায়, পাশ ফিরে শিশুর মতো ঘুমোচ্ছিল।

আমার সে রাতে ঘুম এল না।

অনেক কথা ভিড় করে এল মনে।

আমার মন নিশ্চিত ভাবে নিঃশব্দে বলল, আমি রমেনকেও ভালোবাসি এবং সুশান্তকেও। অথচ আশ্চর্য! এই দুই ভালোবাসা কত অন্যরকম। এ দুই ভালোবাসাই সত্যি। অথচ কত বিভিন্ন এদের রূপ, এদের প্রকৃতি। একজন মেয়ে কি একসঙ্গে দুজনকে ভালোবাসতে পারে না? পারে না কি? আমার ভালোবাসা কি এতই সীমিত যে একজনকে দিয়েই তা নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে? সুশান্তকে দেওয়ার মতো আমার কিছুই কি বাকি থাকবে না? কিছুমাত্র না?

কিন্তু জামশেদপুরের পাট চুকিয়ে কলকাতা চলে গেলে তো সুশান্তর সঙ্গে দেখা হবে না? হবে না কেন? ওকে বলব কলকাতায় ট্রান্সফার নিতে। তারপর যখন ক্যানাডায় চলে যাব তখন? তখন কি সুশান্তকে ক্যানাডাতে যেতে বলব? ঈশ্-শ্ কী শখ আমার? এও চাই ওও চাই। দরকার নেই। রমেন আমার স্বামী। রমেন যদি আমাকে আমি যেমন করে চাই তেমন করে সুখী করে, তাহলে আর সবকিছুই ছাড়তে পারব। এমনকী, সুশান্তকেও।

রমেন নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছিল।

রমেনের পিঠে হাত রেখে মনে মনে বললাম, তুমি ভালো হও রমেন, তুমি ভালো হও। তোমার ভালো হওয়া না-হওয়ার ওপর আমার সমস্ত জীবন, আমার সমস্ত চাওয়া-পাওয়া, আমার পুরো অস্তিত্ব নির্ভর করছে। ভালো হবে তো রমেন? রমু বাবু?

১০

পরদিন খুব ভোরে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

এখনও সূর্য ওঠেনি। রাতে একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল। বেশ একটি মিষ্টি ঠান্ডা আছে সকালে। শোবার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলাম সাধু সাহেব কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। কাপুর সাহেবের বাংলোর পিছনের লনে গোরু দুইছে ওঁদের মালি।

অনেকক্ষণ আমি চুপ করে জানালায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

দিন এখনও আরম্ভ হয়নি, মানে দিনের ব্যস্ততা। গত রাত আর আজকের দিনের মধ্যে এই একফালি ঊষার আভাসের গর্ভবতী নিস্তব্ধতার কোলে একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক কিছু ভাবছিলাম।

আমার জীবনেও এক নতুন ভোর হতে চলেছে। জানি না, এই নতুন দিন আমার জন্যে কী বয়ে আনবে। ভালোই আনবে আশাকরি। ভালোই আনা উচিত। ছোটবেলা থেকে ভালো করেছি, ভালো ভেবেছি, কখনও কাউকে ঠকাইনি, ঠকাবার ভাবনাও ভাবিনি। আমার কেন খারাপ হবে? খারাপ হয়তো হয়েছিল কিছুদিনের জন্যে—কিন্তু সেটা একটা অপস্রিয়মাণ অবস্থা। জীবনে কোনো কিছুই ফেলা যায় না। হয়তো এই খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে বেশ কিছু সময় কাটালাম বলেই আজ ভালোর চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছি। অবিমিশ্র খারাপ বা ভালো বলে কিছু নেই। যাদের জীবনে কেবলি সুখ বা কেবলি অসুখ তাদের জীবন বোধহয় বড় একঘেয়ে, আনইন্টারেস্টিং।

তোমাকে আমি বাতিল করেছিলাম রমেন, তোমাকে হয়তো সত্যিকারের যাচাই না করেই। তোমাকে যেদিন গ্রহণ করেছিলাম আমার সরল অপাপবিদ্ধ মনে, সেদিনও যাচাই করিনি। জীবনে কখনও কোনো কিছুকে আমি সন্দেহের চোখে দেখিনি, যুক্তি, অবিশ্বাস, বিচার-বিবেচনা ইত্যাদি কষ্টিপাথরে আমি আমার হৃদয়সঞ্জাত কোণে বোধকে, কোনো অনুভূতিকেই যাচাই করে তেতো করতে চাইনি। সে বাঁচা বড় সাবধানীর মতো বাঁচা। তার চেয়ে অসাবধানী মৃত্যু ভালো। শুভ্র, অকলঙ্ক সাবলীল হাঁস যেমন প্রথম ভোরে শিউলিতলা দিয়ে দুলতে দুলতে গিয়ে তার কমলা-পায়ে কমলা-রঙে শিউলি ফুলের গালচে পেরিয়ে এক সমর্পণী বিশ্বাসে ভর করে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন পুকুর তাকে বিনিময়ে কী দেবে অথবা দেবে না সে কথা ভেবে সে ঝাঁপায় না। ঝাঁপিয়ে পড়ার আনন্দে নিজের মনে নিজের স্বগতোক্তির প্যাঁকপ্যাঁকানিতে সে শরৎ সকালে নিজেকে সর্বাঙ্গীণভাবে সার্থক করে। পুকুরের মধ্যে যদি কোনো অপূর্ণতা থাকে, তার যদি কিছুই দেয় না থাকে হাঁসটিকে, সে লজ্জা বা সংকোচ তো পুকুরেরই, তাতে হাঁসের হলুদ ঠোঁটের হাসি মোছে না; বোধহয় মোছে না।

আমি নিরুপমা চৌধুরী, ছোটোবেলা থেকে এমনি এক হাঁসের মতো জীবনের পুকুরে বাঁচতে চেয়েছি, সাঁতার কাটতে চেয়েছি। দুঃখ বা সুখ সবকিছুকেই চেষ্টা করেছি হাঁসের গায়ের জলের মতো গড়িয়ে ফেলতে। পৃথিবীর জলে যাতে গা না ভেজে তারই চেষ্টা করেছি সাধ্যমতো। আমি সবসময় মনে করতে চেয়েছি যে, একজন মানুষের সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি সত্ত্বেও কেবলমাত্র বাঁচার আনন্দের জন্যেই তার বেঁচে থাকা উচিত। আমি কি ভুল ভেবেছি? জানি না।

সত্যি কথা বলতে কী সুশান্তর সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগে আমার মনে হত না বাইরের এই দৃশ্যমান জগতে আমিও একজন গণ্য লোক। আগে, এই নিরন্তর জীবনযাত্রা, যাতে আমি সবসময়েই উপস্থিত ছিলাম; এই অনাদিকাল থেকে প্রবাহিত ও আমার সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট প্রবহমান জগতে আমি কোনো ক্ষণিকের অতিথির মতো নিরুত্তাপ উদাসীনতায় সবকিছু অমনোযোগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করতাম। আমার কখনও মনে হত না, মনে হয়নি যে, এই দৃশ্যাবলীতে, এই বিভিন্ন অঙ্কের নাটকে ক্ষুদ্র হলেও আমারও একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত-নির্দেশক পটভূমিকা আছে। চিরদিনই চালিত না হয়ে, এই জগৎকে

আমার অভিমত, খুশি ও ইচ্ছা দ্বারা চালিত করার অধিকারটুকুই যে আমার আছে শুধু তাই-ই নয়, সেই অধিকারের জবরদখল নেওয়াও যে আমার কর্তব্য এমন কথা আমার কখনও মনে হয়নি আগে।

সুশান্তই প্রথমে আমার দু চোখে চোখ রেখে বলেছিল, তোমাকে তোমার নিজের জন্যেই বাঁচতে হবে, অন্য কারও জন্যে নয়, তোমার নিজের জন্যে, নিজের কারণে। বলেছিল, 'তুমি নিজে তোমার কাছে চরম সত্য, পরম অনুভূতি। তোমার নিজের পরিপ্রেক্ষিতে আর সবকিছুই, সকলেই তুচ্ছ—।' সেই তোমার মধ্যের আশ্চর্য নীরব অথচ প্রচণ্ড বাঙ্ময় তুমিকে না চিনতে পারলে, না ভালোবাসলে তোমার বেঁচে থেকে লাভ কী? বলেছিল, তোমার জগতে তুমিই সবকিছুকে আবর্তিত, চালিত ও নির্ধারিত করবে। বাঁচবে, শুধু তোমার নিজেরই শর্তে; নিজের সুখের জন্যে। পৃথিবীর অন্য কেউই—স্বামী, পুত্র, প্রেমিক, বাবা, মা, অন্য কেউই যেন তোমার এই সুস্থ স্বাভাবিক মানসিকতার প্রতিবন্ধক না হয়।

হঠাৎ মনে হল, সুশান্ত কি এত কথা বলেছিল? মনে পড়ে হাসি পেল। নাঃ ও এত কথা মুখে বলেনি, কিন্তু চোখে বলেছিল। মুখের কথায় আমরা কেই বা কতটুকু বলতে পারি? মুখে শুধু বক্তব্যর আভাসমাত্র দেওয়া যায়। মূল বক্তব্য শ্রোতাকে নিজেকেই নিজের মনে মনে, মনের কানে শুনে নিতে হয়।

ঠিক বলেছিল সুশান্ত।

রমেন ওঠার আগেই আমি চান করে নিলাম। তারপর পেছনের বারান্দায় চা নিয়ে বসলাম।

পেঁপে গাছে কতকগুলো শালিক এসে বসে কিচিরমিচির করছিল। ভোরের নরম রোদ একফালি রুক্ষ ঘাসওঠা জমিতে পড়েছে। সোনাঝুরি গাছের ডালগুলো এদিকটাতে ঝুঁকে আছে। বেশ ছায়াচ্ছন্ন থাকে জায়গাটা দুপুরবেলা। এই জায়গাটা আমার বড় প্রিয় জায়গা। আমার একা বসে ভাবার জায়গা।

প্রত্যেক মেয়েরই বাড়ির মধ্যে কোনো-না-কোনো একটা বিশেষ জানালা, বারান্দার কোনো বিশেষ কোণ এমনি প্রিয় থাকেই—যেখানে এক কাপ চা নিয়ে এসে বসে আমার মতো লক্ষ লক্ষ মেয়ে তাদের সংসারের অনেকানেক ঝামেলা ও অশান্তি ভুলে যেতে চেষ্টা করে। এক চিলতে নীল আকাশে হঠাৎ চোখ পড়ে যায়—ঘুরে ঘুরে ওড়া কোনো চিলের তীক্ষ্ণ ডাক সেই-সেই মুহূর্তে চমক তুলে যায় বুকের মধ্যে—তার শৈশবের, কৈশোরের, তার যৌবনের অনেক স্মৃতি মুহূর্তের মধ্যে ঝিলিক মেরে যায় মাথার মধ্যে। কোনো স্নেহময় বাবার মুখ, দারিদ্র্যক্লিষ্ট মায়ের মিষ্টি ক্ষমাময় হাসি, কোনো বিস্মৃত উত্তীয়র সুস্থ উজ্জ্বল চোখ তখন মনের কোণে আসা-যাওয়া করে।

ক্ষণকালের জন্যে।

পরমুহূর্তেই চায়ের কাপ খালি হয়ে যায়, সংসারে, স্বামীর, ছেলেমেয়ের অথবা জীবিকার প্রতি কর্তব্যের ডাক আসে। শূন্য চায়ের কাপ এবং শূন্য মন নিয়ে আকাশের হাতছানি ছেড়ে চিলের ডানার গন্ধ মন থেকে মুছে ফেলে তাকে আবার ঘরের মধ্যের অন্ধকারে ফিরতে হয়। সব মেয়েকে। যে মেয়েদেরই মন আছে। এমনি করেই।

রমেন উঠে পড়েছিল।

মুখী আজ সকাল-সকাল এসেছিল। কাল ওকে বলে রেখেছিলাম যে আমরা সকাল-সকাল চা জলখাবার খেয়ে ব্যাঙ্ক খুললেই ব্যাঙ্কে যাব।

রমেন বাথরুম থেকে চান করে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে এল। তারপর ঘরে গেল জামাকাপড় পরতে। জামাকাপড় পরে এসে চা খেল।

ব্যাঙ্ক খোলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আমরা গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু টাকা তুলতে গিয়ে এক বিপত্তি হল। আমার সেভিংস ব্যাঙ্কে তিন হাজার পঁয়ত্রিশ টাকা ছিল। তিন হাজার টাকা তুলব শুনে কাউন্টারের

ভদ্রলোক বললেন, তাহলে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে হবে। সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকে ওভাবে টাকা তোলা যায় না। অগত্যা অ্যাকাউন্টটাই বন্ধ করতে হল। রমেনকে একশো টাকার ত্রিশটা নোট দিয়ে, আমি আমার হাত ব্যাগে পঁয়ত্রিশটা টাকা রাখলাম। মাইনে পাব আবার স্কুল খুললে। তাই ভালোই হল এই টাকাটা পেয়ে।

ব্যাঙ্কে এত সময় লেগে গেল যে বলার নয়। তারপর সেখান থেকে লকারে গেলাম। লকারে থাকার মধ্যে কিছুই ছিল না। একটা কাপড়ের বটুয়ায় গয়নাগুলো ছিল। অনেকদিন পর গয়নাগুলো খুলে দেখলাম।

এই পেন্ডেন্টটা বড়দি ও বড় জামাইবাবু দিয়েছিলেন। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর দোকান থেকে আমার পছন্দমতো কিনে দিয়েছিলেন। আর এই দুলটা ছোড়দির দেওয়া। এটা নিয়ে আমার বাসিবিয়ের দিন, মানে যেদিন রমেনের সঙ্গে আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম সেদিন অনেক কাণ্ড হয়েছিল। সবাই মোটামুটি ভালোই প্রেজেন্টেশান দিয়েছিলেন। সুবীরদার সে সময় চাকরিটা ছিল না। বিলিতি কোম্পানির ভালো চাকরিটা গিয়েছিল মাস ছয় আগে। উনি নিরুপায়ভাবে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। আমাকে ছোড়দি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত। স্বাভাবিক। আমরা পিঠোপিঠি ছিলাম। অথচ আমার বিয়েতে ছোড়দি একটা সামান্য দুল ছাড়া কিছু দিতে পারল না বলে ছোড়দির মনে খুব কষ্ট ও লজ্জা হয়েছিল। যদিও এর কোনো মানে হয় না। কিন্তু মানে না হলেও মেয়েদের মনে এমন এমন অনেক কিছু হয় যা পুরুষরা কখনও বোঝে না।

বিয়ের দিন ছোড়দি ঐ দুল সকলের সামনে দিল না। বলল, আমার লজ্জা করে। আমি জানি, বিয়ের ধুমধামের মধ্যে ছোড়দি বাথরুমে গিয়ে কেঁদেছিল। বাসিবিয়ের দিনও ছোড়দি ছিল না। বাসিবিয়ের দুপুরে আমি বললাম, তুই কী রে ছোড়দি? আমার সঙ্গে তোর কি দেনা-পাওনার সম্পর্ক? আমাকে যদি তুই কিছুই না দিতিস তাতেই বা কী হত? তাছাড়া তুই কি আমাকে কিছুই দিসনি? কত আদর করে তুই আর সুবীরদা বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিস, কত জায়গায় কত কত খেয়েছি, মজা করেছি আর এখন সুবীরদার অসুবিধে আছে বলে তুই এরকম করবি? সুবীরদা জানলে কী ভাববে বল তো? আমাদের কত খারাপ ভাববে। ছোড়দি বলেছিল, ওর জন্যেই তো আমার কষ্ট। ও যখন পেরেছে সকলকে ও এত আনন্দ করে দিয়েছে, খাইয়েছে যে; সে বলার নয়। এখন ওর চোখের দিকে তাকাতে আমার কষ্ট হয় রে নীরু। যে লোকের জন্য করে, লোককে ভালোবাসে সেই একমাত্র জানে, সে যখন আর করতে পারে না তখন তার মনে কী হয়।

ছোড়দি কাঁদতে কাঁদতে নিজের হাতে দুলটা পরিয়ে দিয়েছিল আমার কানে।

ছোড়দির জন্যে আমি এই আড়াই তিন বছরে প্রায় কিছুই করতে পারিনি। সুবীরদার জন্যেও না। তবু সেই সব ঐতিহাসিক গয়নাগুলোকে আজ আমি রমেনের হাতে তুলে দিলাম। কারণ রমেন আমার স্বামী। একজন মেয়ে এই একটি প্রাপ্তির বিনিময়ে পৃথিবীর অন্য সব ক্ষেত্রে হাসিমুখে সর্বস্বান্ত হতে রাজি থাকে। যদি রমেনরা শুধু এই কথাটা বুঝত, পুরোপুরি বুঝত, তাহলে কোনো দুঃখের কারণ ছিল না।

গয়নাগুলোর দাম সবসুদ্ধ কত হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। তবে বিয়ে ও বৌভাতের প্রেজেন্টেশান ও আমাদের বাড়ি থেকে যে গয়না দেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে পনেরো হাজার টাকার মতো হবে কম করে। সেদিন আমার যা কিছু জাগতিক সম্মতি ছিল সব নিঃশেষে রমেনের হাতে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরলাম ওর সঙ্গে।

অনেক অনেকদিন পর দুজনে একসঙ্গে খেতে বসলাম। মুখী ঝিঙে-পোস্ত, মুগের ডাল আর ছানার ডালনা করেছিল।

খেতে খেতে রমেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল বারবার।

আমি বললাম, ও কী? ভালো করে খাও। কী হয়েছে তোমার? কারখানার কথা ভাবছ!

ও বলল, না, শালার চাকরিই যখন করব না তখন ভাবনা কীসের? একটা ক্যাজুয়াল লিভের দরখাস্ত ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। তারপর যা হবার হবে।

আমি শুধোলাম, তোমার এ মাসের মাইনে নেবে না? আজ তো তেইশ তারিখ।

রমেন বলল, নিশ্চয়ই নেব। কলকাতা থেকে ফিরে আসি।

আমি হেসে বললাম, হ্যাঁ বাবা, মাইনে না নিলে মুশকিল। এ মাসটাই মুশকিল। আমি তো মাইনে পাব সেই স্কুল খুললে। প্রায় পৌনে দু'মাস পরে।

কথাটা বলতে আমার লজ্জা করল, এ পর্যন্ত রমেনকে কখনও আমি টাকার কথা বলিনি। এমনকি সংসারের টাকার কথাও নয়! কিন্তু এ মাসে না বলে উপায় ছিল না।

রমেন বলল, জানি। আমার কী দায়িত্ব বলে কিছু নেই?

রমেন সেদিন কলকাতা গেল না। বিকেলে কার কার সঙ্গে যেন দেখা করতে বেরিয়েছিল। ফিরল অনেক রাত করে। মুখে গন্ধ পেলাম।

রমেন বলল, সেনের বাড়ি গিয়েছিলাম।

আমি বললাম, সেন তো মদ খায় না।

রমেন বলল, সেন খায় না, সেনের বন্ধু-বান্ধব খায়। তারা এসেছিল। ওরা সকলে মিলে আমাকে ফেয়ার-ওয়েল দিল। সেনের হাতে ছুটির অ্যাপ্লিকেশনটাও দিয়ে এলাম।

আমি বললাম, ছুটির অ্যাপ্লিকেশন কেন? তুমি তো বললে চাকরি ছেড়ে দেবে?

রমেন বলল, যে ক'দিন কাজ না করে মাইনে পাওয়া যায় শালাদের কাছ থেকে।

প্রথম প্রথম রমেনের মুখে শালা কথাটা বড় ধাক্কা দিত। আজকাল শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

আমার মনে অনেক কথা এসে ভিড় করেছিল। নানাবকম অবয়বহীন ভয়। আবার ছেঁড়া মেঘের মতো তা উড়েও যাচ্ছিল। এখন আমার রমেনকে বিশ্বাস করতে হবে পুরোপুরি—বিশ্বাস না করার জন্যেই হয়তো রমেন চিরদিন নিজেকে এমন করে আমার কাছে গুটিয়ে রেখেছিল। যা বলতে চেয়েছিল, চেয়েছে আমার কাছে তার উলটোটাই বলেছিল, বলে এসেছে চিরদিন। যে ভুল করেছি, যে দুঃস্বপ্ন দেখেছি তা আমি ভুলে যাবার চেষ্টা করব। এখন রমেনকে বিশ্বাস না করলে আমি নিরুপায়। রমেনকে, রমেনের মধ্যের ভালোত্বকে, সততাকে আমার বিশ্বাস করতেই হবে।

১১

রমেন চলে গেছে প্রায় চার-পাঁচদিন হল।

বিয়ের পর আমি কখনও একা থাকিনি। এই প্রথম একা একা। সত্যি কথা বলতে কী রমেন যখন কলকাতা যাবে বলেছিল তখন এই ভেবে খুব ভালো লেগেছিল যে অন্তত দু'একদিন কোনোরকম ভয় বা সংকোচ না করে সুশান্তকে আমার কাছে পাব। মুখীকে ছুটি দিয়ে দিলেই হবে—তারপর আমি কয়েকঘণ্টার জন্যে পুরোপুরি সুশান্তর হয়ে যাব। ও ওর নরম ছেলেমানুষি সৎ চোখ দিয়ে লজ্জামাখা মুখে আমাকে দেখবে, আমার সমস্ত আমিকে—আর শিউরে উঠবে ভালোলাগার, সেদিন যেমন উঠেছিল। আমার ভাবতেই ভালো লাগছে আমার মধ্যে এমন জাদু আছে যে, আমাকে দেখেই

কেউ অমন করতে পারে। সুশান্তটা বড় ছেলেমানুষ। বড় ছেলেমানুষ। ও যা বলেছিল, তা সেদিন আমি বিশ্বাস করেছিলাম। আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে, ওর জীবনে আমিই প্রথমা। এ কথাটা শুধুই বোঝার কথা, অনুভবের কথা, প্রমাণ করার কথা নয়।

ভেবেছিলাম; অনেক কিছু ভেবেছিলাম। এই ভাবনা মনে আসাতে প্রথমে মনে মনে নিজেকে খুব বকেছিলাম। আমি কী খারাপ মেয়ে? আমার কী চরিত্র ভালো নয়? তারপরই মনে হয়েছিল চরিত্র মানে কী? চরিত্র বলতে কী বোঝায় এই ভাবনাটা আমাকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলেছিল। নিজেকে বলেছিলাম, চরিত্র কথাটার যেমন একটা সাধারণ সমাজ-স্বীকৃত মানে আছে, তেমন প্রতিটি মানুষ-মানুষীর চরিত্রই আলাদা। যাত্রাদলের বিবেকের মতো, সমাজের এককালীন প্রতিভূদের মতানুসারে যারা চরিত্রের ব্যাখ্যা চার খোঁটার মধ্যে সীমিত রেখেছেন, আমি তাদের দলে নই।

আমি যা ভাবি, যা করি, আমি যেরকম প্রতিক্রিয়াশীল, তার ওপর আমার চরিত্র নির্ভর করে। অন্য কথায়, সেইটাই আমার চরিত্র। অবশ্য এ কথা সত্যি যে, আমার প্রথম প্রেমিক, আমার স্বামীর মধ্যে আমি যা চেয়েছিলাম, তা যদি পেতাম, আমি যদি এমনভাবে বঞ্চিত না হতাম, তাহলে হয়তো আমার চরিত্রর যে-কোনো তথাকথিত চরিত্রের মতোই হতেও পারত। কিন্তু আমি আমার জীবন দিয়ে, জীবনের ভুল দিয়ে, জীবনের সমস্ত নিখাদ অনুভূতি দিয়ে বুঝেছি যে, সেই সম্মত চরিত্রে বা কোনো কাচের আলমারিতে রাখা অভিধানে কিছুই খোঁজার নেই। চরিত্রর ব্যাখ্যা প্রতিটি মানুষের কাছেই আলাদা আলাদা। তার জীবনের প্রাপ্ত আঘাত, আনন্দ, বেদনা তার জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত তার চরিত্রকে বদলে দিতে বাধ্য। প্রত্যেকের চরিত্রই জলের মতো। জীবনের আকার অনুপাতে, আকারের ঢাল মতো তা গড়িয়ে যায়। তাকে তার সামাজিক ও পৌরাণিক ব্যাখ্যার বদ্ধতায় কখনোই ধরে রাখা যায় না। হয়তো ধরে রাখা উচিতও নয়। যারা সেই বদ্ধতায় বিশ্বাস করে, তারা চরিত্রের ব্যাখ্যা ঠিক রাখতে গিয়ে নিজেদেরই বেঠিক করে, বদলে ফেলে। নিজেদের জীবনে চরিত্ররক্ষার মিথ্যা অবক্ষয়ী প্রাপ্তিহীন যুদ্ধে তারা নিজেদের শুধু কাতরই করে, ক্ষুব্ধই করে। এ পৃথিবীর কাছে তাদের পাওয়ার থাকে না কিছুই। তাই আমি ঠিক করেছি, আমি বাঁচব। সুশান্তর কথামতো আমি নিজের সুখের জন্যেই বাঁচব—আর কারও জন্যেই নয়।

আসলে এ সময়ে সুশান্ত জামশেদপুরে থাকলে খুব ভালো হত। কিন্তু রমেন যেদিন গেল, তার পরদিন ভোরে সেও ট্যুরে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেনি—ময়ূরকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল শুধু একটা। এখন আমার স্বামীও নেই, প্রেমিকও নেই। আমি এখন একা, রক্ষীহীন; প্রেমহীন। এমনভাবে কি কোনো মেয়ে থাকতে পারে? সুশান্তকে জানার আগে আমি জানতাম না যে আমার জীবনও এত স্পর্শকাতর, এত আনন্দ-ভিখারী। কোনো শরীর নয়, কাউকে বুকের মধ্যে পাওয়া নয়, এই বোধটা একটা দারুণ অন্যরকম বোধ। যে-বোধ শরীরের আনন্দের চেয়ে অনেক তীব্র। যে বোধ, যে উষ্ণতার বোধ একজনের সমস্ত শীতার্ত কষ্টকে এক আশ্চর্য মসৃণ দামী আরামে ভরে দিতে পারে।

মুখী ঘর পরিষ্কার করে মুছে, কী রান্না হবে তা জিজ্ঞেস করতে এসেছিল। আমি শোবার ঘরে আমার পড়ার টেবিলের সামনে দু'হাতের তেলোয় মুখ রেখে জানালার পাশে বসেছিলাম। রান্নার কথা মুখীকে বলেছিলাম। যা হয় কিছু রাঁধতে। আমার একার জন্যে কোনোরকম ঝামেলা করতে ভালো লাগে না আমার। আজ সকাল থেকেই কুঁড়েমি লাগছিল। মাঝে মাঝে আমার এমন হয়। কিছুই করতে ভালো লাগছিল না। বসে বসে পর পর তিন কাপ চা খেয়েছিলাম, পরীক্ষার খাতার বান্ডিল সামনে খোলা ছিল—একটাও খাতা দেখা হয়নি—দেখা হবে শিগগিরি যে, এমন সম্ভাবনাও দেখছি না। সেদিন নমিতাদি ভালো বলেছিলেন। বলেছিলেন, তোরা সব নতুন নতুন দিদিমণি হয়েছিস,

তোদের উৎসাহই আলাদা। আমরা আর কী তোদের মতো করে খাতা দেখি? বিশেষ করে আজকালকার ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার খাতা। আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, তাহলে কী করে দেখেন? কোনো বিশেষ কায়দা আছে কি?

নমিতাদি দুটো পান মুখে দিয়ে, দু আঙুলে একটি সুগন্ধি জর্দা উঠিয়ে অনেক উঁচু থেকে মুখে ফেলে পান-জব্‌জবে গলায় বলেছিলেন, আছে।

আমি শুধিয়েছিলাম, সেটা কী?

নমিতাদি বলেছিলেন, আমার বাড়ির পেছনে, আমার চাকরের থাকার একটা খাপ্‌রার ঘর আছে। বান্ডিলসুদ্ধু খাতা তার ছাদে ছুঁড়ে মারি। যেগুলো ছাদে থেকে যায় সেগুলো পাস; আর যেগুলো গড়িয়ে পড়ে যায়, সেগুলো ফেল।

নমিতাদির কথা শুনে টিচার্স-রুমের আমরা সকলে হি-হি করে হেসে উঠেছিলাম।

নমিতাদি সেই হাসিতে যোগ দিয়ে বলেছিলেন, ঠাট্টা নয়, পরীক্ষা করে দেখিস, প্রত্যেকটা খাতা আলাদা করে দেখলেও ওর চেয়ে ভালো কিছু ফল হয় না।

স্কুলের সকলে বলে নমিতাদির সঙ্গে স্কুলের সেক্রেটারির অ্যাফেয়ার আছে। আমার বিশ্বাস হয় না। নমিতাদির বড় ছেলের বয়স সতেরো, মেয়ের বয়স পনেরো, নমিতাদির নিজের বয়স বেয়াল্লিশ, সেক্রেটারির বয়স বাহান্ন এবং তাঁর বড় ছেলের বয়স বাইশ। বিশ্বাস হয় না। কিন্তু রত্না বলেছিল, ওর নিজের চোখে দেখা। জানি না, হয়তো হবে। নমিতাদির জীবনে আনন্দের একটু সুপ্ত ফল্গুধারা আছে। নইলে উনিও হয়তো অন্যান্য সিনিয়র দিদিমণিদের মতো খিটখিটে, গোমড়ামুখো হয়ে যেতেন। জীবন সম্বন্ধে এত উৎসাহ থাকত না হয়তো, এত হাসতে পারতেন না সময়ে অসময়ে, মনটা হয়তো এত উদার থাকত না। জীবনে নিয়মবদ্ধতা না থাকলে, সংসারের কৃপণ হাতায় আনন্দের জলপান না করলে, এবং সামাজিক সমাজের আড়ালে কোনো গোপন সম্পর্ক থাকলেই কি মানুষ এমন উদার হয়? হাসি-খুশি হয়? তারাই কি একমাত্র লোক যারা জীবনের একঘেয়েমি ও দৈনন্দিনতার মধ্যে থেকেও এক আশ্চর্য আনন্দের ভাগীদার হয়? জানি না আমি। এখনও জানি না। সুশান্তকে আমি এখনও তো তেমন করে পাইনি, তাকে আমার নিজের করে জানি না।

যদি সত্যিই রমেন ক্যানাডা চলে যায়, তাহলে তো আমারও একদিন না একদিন যেতেই হবে। কিন্তু যতদিন না যাই ততদিন সুশান্ত কী আমার একাকিত্ব ভরিয়ে রাখবে সবদিক দিয়ে? আর যদি সুশান্তকে বেশিরকম ভালো লেগে যায় তাহলে কি আমার ক্যানাডা যাওয়া হবেই না? সুশান্তর মধ্যেই সমস্ত পৃথিবী প্রত্যক্ষ করতে হবে? সুশান্ত কি আমাকে তেমন করে চায়? বুঝি না, ও বড় গভীর, ওর চোখের চাউনির কোনো তল নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় ওকে বুঝি আমি, পর মুহূর্তেই মনে হয় যে ওকে বুঝি না। ও যেন কীরকম। হেঁয়ালির মতো।

জানালার পাশে বসে কত কী ভাবতে ভাবতে একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, এমন সময় মুখী এসে বলল, দিদিমণি চিঠি।

রমেনের চিঠির আশা করছিলাম আমি। একদিন বলে গেল যাওয়ার সময়, আর এখনও ফেরার নামটি নেই; কোনো খবরও নেই। কিন্তু না। দুটি চিঠির মধ্যে একটি বাবার লেখা। অন্যটির হাতের লেখা তেমন চেনা নয়।

প্রথমে বাবার চিঠিটা খুললাম। গতকাল লেখা চিঠি। বাবা লিখেছে, বাবা ভালো আছেন (আমি জানি যে কথাটা সত্যি নয়)। তারপর আমার খবর জানতে চেয়েছেন। শেষে লিখেছেন, রমেন কলকাতায় এসেছে? ওঁর বন্ধু, আমার পরমেশকাকা যিনি রেসের বুকমেকার, তিনি নাকি রমেনকে রেসের মাঠে দেখেছেন। বাবা বলেছেন, যে রমেশকাকা নিশ্চয়ই ভুল দেখেছেন কারণ রমেন কলকাতায়

এসেছে অথচ ওর সঙ্গে দেখা করেনি, এ হতে পারে না।

অন্য চিঠিটা খুলতেই আনন্দে আমার বুক ধক্ করে উঠল। সুশান্ত লিখেছে পাটনা থেকে। ছোট্ট সুন্দর হস্তাক্ষরে, কিন্তু কী সুন্দর যে চিঠি।

২/৫/৭৩

নিরুপমা,

অনেক জায়গা ঘুরে কাল এখানে এসেছি। এখানে গরম আরও বেশি। কিংবা জানি না, আমার হয়তো বেশি লাগছে। কারণ জামশেদপুর ছাড়া ইদানীং এই উত্তপ্ত পৃথিবীর আর কোথাওই আমার ভালো লাগে না। একমাত্র ওখানেই আমার ওয়েসিস্ আছে, টলটলে শান্ত নীল জল, খেজুরগাছের ছায়াঘেরা, একমাত্র সেখানে জীবনের কোনো বেদুইন ডাকাতকেই আমার ভয় করার নেই।

তুমি কি জানো সে ওয়েসিসের খবর?

তুমি কেমন আছো?

ভালো থেকো, সবসময় ভালো থেকো। সবসময় সুন্দর করে সেজে থেকো, বুঝলে?

পরশু ফিরব। পাটনা থেকে গজাধর মণ্ডির বিখ্যাত দোকানের তিলের খাজা নিয়ে যাব তোমার জন্যে। ছোটোমেয়েরা আর কী কী ভালোবাসে জানি না। লাল-নীল রিবন্? ক্যাডবারি চকোলেট? বেলোয়ারী চুড়ি?

এসব কিছুই নিয়ে যাব না, তবে বেলোয়ারী চুড়ির মতোই ভঙ্গুর একটি ভীষণ দামী জিনিস তোমাকে ইতিমধ্যেই দিয়েছি। তাকে খুব সাবধানে রেখো। তোমার নরম ভালোবাসার চোখ থেকে তাকে তোমার মন থেকে এক মুহূর্তের জন্য সরালে, তাকে উপেক্ষা করলে, তা ঝুন্ ঝুন্ করে কাচের চুড়ির মতোই ভেঙে যাবে।

তুমি কি জানো, সে জিনিস কী? কী তার নাম?

ইতি—তোমার কাছের
সুশান্ত।

চিঠিটাকে বারবার পড়লাম। কতবার যে পড়লাম, তার ঠিক নেই। এতবার পড়েও আশ মিটল না। সুশান্ত সুন্দর করে কথা বলে জানতাম। ও যে এমন সুন্দর চিঠি লেখে, কেউ যে এমন সুন্দর করে চিঠি লিখতে পারে; তা আমার জানা ছিল না।

চিঠিটাকে কোথায় রাখব, কী করে যত্নে রাখব ভেবে পেলাম না। সে সব পরে ভাবা যাবে। এক্ষুনি, এই মুহূর্তে চিঠিটাকে আমার বুকের ভাঁজে গুঁজে রাখলাম, লুকিয়ে। আপাতত সুশান্ত এবং আমাকে ঘিরে তার সব সুন্দর উজ্জ্বল সমস্ত ভাবনাগুলি এখানে ঘুমিয়ে থাকুক। এর চেয়ে নিভৃততর নিশ্চিন্ততর সুন্দরতর কোনো ঠাঁই তো মেয়েদের নেই!

সুশান্তর চিঠিটিকে তুলে রেখেই আমার বাবার চিঠির কথা মনে পড়ল। চিঠিটা আরেকবার পড়তেই বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। রমেন একদিনের জন্যে কলকাতা গিয়ে রেসের মাঠে কী করছে? এতদিন হল যখন ওখানে আছেই তখন বাবার সঙ্গেই দেখাই বা করল না কেন? আমার মনের মধ্যে অনেক খারাপ ভাবনার প্রস্তাবনার ঝড় উঠল, কিন্তু তাদের আমি দূর-দূর ছাই-ছাই করে তাড়ালাম। তাদের বললাম, আমার মনটাই ছোটো, আমিই মানুষকে বিশ্বাস করি না, মানুষের ভালোত্বে, সততায় বিশ্বাস করি না, তাইত আমার কপালে এত দুঃখ।

যে ভাবনাগুলো মনের মধ্যে ভয়-দেখানো মুখোশ পরে উঁকিঝুঁকি মারছিল সেগুলোর দিক থেকে মুখ সরিয়ে আমি আবার সুশান্তর চিঠিটার কথা ভাবলাম। সুশান্ত লিখেছিল সে পরশু আসবে—দু তারিখের চিঠি। আর আজ চার তারিখ।

সুশান্ত আসবে, আজ আসবে, অথবা এসে গেছে ইতিমধ্যেই। এই ভাবনাটা আমাকে তখনকার মতো ভীষণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমার মন বলতে লাগল, আজ যেন রমেন না আসে, রমেন যেন আজ না আসে। আমি তো আইনত রমেনরই; কিন্তু আমি তো সুশান্তর বে-আইনের। এই বেইমানি অথবা বে-আইনির আনন্দর জন্যে আমার সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে রইল।

সেদিন আমি খুব ভালো করে চান করলাম। অনেকদিন আগে একদিন সেন আমার শরীর ছুঁয়েছিল বলে খুব ভালো করে চান করেছিলাম। আমার শরীরের অণু-পরমাণু থেকে সেনের ছোঁয়ার কালিমা মুছে ফেলার জন্যে। আজও আমি ভালো করে চান করছি। কিন্তু আশ্চর্য! সম্পূর্ণ অন্য কারণে। আজ একজন আমার শরীর ছোঁবে বলে আমার শরীরের অণু-পরমাণুতে যেন কোথাও কোনো কালিমা না থাকে সেজন্যে আমি চান করছিলাম। আমি নিরুপমা, আমার মনের মধ্যের নিরুপমের জন্যে আমি নিজেকে নির্দ্বিধায় প্রস্তুত করছিলাম। মনের মতো শরীরেরও প্রস্তুতি লাগে। লাগে না?

আমি ঠিক করেছিলাম যে, নিজে থেকে আমি সুশান্তর খোঁজ নেব না। কেন জানি না, একরাশ লজ্জা এসে আমার সমস্ত মন ছেয়ে ফেলল। মনে হতে লাগল যে, আমার কী দায়? সে যদি সত্যিই তেমন করে আমাকে চায়, তো সেই আসুক। আমি একজন মেয়ে। আমি নির্লজ্জতা ভালোবাসি, কিন্তু তা অন্যের মধ্যে। আমরা নিজেরা তা বলে অমন নির্লজ্জ হতে পারি না! এটা আমাদের দোষও নয়; গুণও নয়। ভগবান আমাদের এমনি করেই তৈরি করেছেন। আমরা কী করব?

সুশান্ত এসেছে কী আসেনি আমার জানার উপায় ছিল না। তবু, আন্দাজেই আমি মুখীকে বলেছিলাম, তুই তো ছুটি-ছাটা পাস না, যা তুই বিকেলের শো-তে সিনেমা দেখে আয় তোর বরের সঙ্গে। বলে, ওকে পয়সাও দিয়ে দিলাম। বললাম, ন'টা-সাড়ে ন'টার মধ্যে ফিরে আসিস কিন্তু।

মুখী চলে যাওয়ার পরই আমি চান করতে ঢুকেছিলাম। চান করে বেরিয়ে অনেক অনেকক্ষণ ধরে আয়নার সামনে বসে সাজলাম। আলমারির সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটা কালো জমি লাল পাড়ের ধনেখালি শাড়ি বের করলাম--সঙ্গে ম্যাচ-করা কালো ব্লাউজ একটা। লাল পুঁতির একটা মালা বের করলাম ড্রয়ার খুঁজে। শাড়ি-টাড়ি পরে বড় করে কালো টিপ পরলাম, ঠোঁটে হালকা করে ভেসলিন্ লাগালাম।

সাজা যখন শেষ হল তখন আয়নার সামনে একবার দাঁড়িয়ে ভালো করে নিজেকে দেখলাম। কলেজে পড়ার সময় যেমন মাঝে মাঝে দেখতাম নিজেকে। সত্যি বলছি, ভারী গর্ব হল। আমি নিরুপমা চৌধুরি সেই ছোটোবেলার প্রজাপতির মতো, কাচপোকার মতো গুন্‌গুন্ করা দিনগুলোতে ফিরে গেলাম যেন। মনে হল, যা সাজা হয়েছে এই-ই ভালো হয়েছে। এর চেয়ে বেশি সাজলে বেমানান হত, সুশান্তর কাছে আমার মনটা বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ত। মেয়েদের এতখানি স্পষ্ট হতে নেই; কোনো ব্যাপারেই বোধহয় নয়। অস্পষ্ট থাকার মধ্যেই মেয়েদের সব জারিজুরি। যে মেয়েরা এটা না বুঝেছে তারা এখনও কিছুই বোঝেনি।

হঠাৎ একটা কথা মনে হয়ে আমার খুব হাসি পেল। যদি সুশান্ত সত্যিই এসে থাকে, যদি সত্যিই একটু পরে এখানে আসে, আমার কাছে আসে, তাহলে এই এত কষ্ট করে পরা শাড়ি, এত কষ্ট করে সাজা আমার সমস্তই এক মুহূর্তে মাটি হবে। আমার সমস্ত আবরণ, আভরণ; নিরাবরণতাতে পর্যবসিত হবে। কিন্তু তাই কি? নিরাবরণ হওয়ার জন্যেই তো এত আবরণ! নির্লজ্জতাই কি সমস্ত লজ্জার শেষ গন্তব্য নয়?

সাজগোজ শেষ করে বসবার ঘরে এসে রাস্তার দিকের জানালায় দাঁড়িয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে সুশান্তর বাড়ির দিকে চাইতে লাগলাম। কেন জানি না, আমার মন কেবলি বলতে লাগল সুশান্ত এসেছে।

কেন জানি না, মন বলতে লাগল যে আমি কেমন করে সুশান্তর জন্যে নিজেকে তৈরি করলাম, সুশান্তও বুঝি আমার জন্যে তেমনি করে নিজেকে তৈরি করছে। করছে কি ? ছেলেরাও কি মেয়েদের মতো এত রোমান্টিক হয়? সব ছেলে হয় না; যেমন রমেন। কিন্তু কেউ কেউ হয়; যেমন সুশান্ত। সুশান্ত জানে কী করে কাউকে চাইতে হয়, কী করে কাউকে পেতে হয়। সুশান্ত নিশ্চয়ই জানে যে চাওয়াটাও, পাওয়ার মতোই একটা দারুণ আর্ট। সব মেয়েরা এমন পুরুষকে পছন্দ করে কি না জানি না। কিন্তু আমি করি।

জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম ময়ূর একবার দরজা খুলে বেরোল। একটু পরে হাতে দেশলাই আর সিগারেট নিয়ে ফিরে এল।

আমার মনটা আনন্দে নেচে উঠল। তাহলে সুশান্ত নিশ্চয়ই ফিরেছে। খুব জানতে ইচ্ছে হল, সুশান্ত এখন কী করছে?

একটু পরেই দেখি সুশান্ত বাইরে বেরোল। পায়জামা পাঞ্জাবি পরে। বেরিয়েই আমাদের বাড়ির দিকে আসতে লাগল।

আমার হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে আমার গলায় উঠে এল। হিন্দী সিনেমাতে একেই বোধহয় "দিল ধড়কানো" বলে। কী করব, কী করা উচিত আমি ভেবে পেলাম না। তাড়াতাড়ি আমি জানালা থেকে সরে এসে এ সপ্তাহের 'দেশ'টা নিয়ে সোফায় বসে পড়লাম, যেন কত মনোযোগ সহকারে 'দেশ' পড়ছি।

সুশান্ত আসতেই, দরজায় বেল টিপতেই, আমি তক্ষুনি দরজা খুললাম না। ইচ্ছে করে ওকে একটু দাঁড় করিয়ে রাখলাম, যাতে ও আমার আগ্রহ বুঝতে না পারে।

দরজাটা খুলতে গেলাম 'দেশ'টা হাতে নিয়েই, যেন সুশান্ত আসবে এমন কথা আমার জানাই ছিল না।

দরজাটা খুলেই, যেন খুব অবাক হয়েছি এমনভাবে বললাম, বেড়ানো হল?

আমার মুখ যাই-ই বলুক, ওকে দেখে যে আমি খুব খুশি হয়েছি এ ভাব কিন্তু গোপন রইল না আমার মুখে।

ও অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। মুখের দিকে নয়, চোখের দিকে।

তারপর বলল, রমেনবাবু ফেরেননি?

আমি মাথা নাড়লাম।

ও বলল, আজ ফেরার কথা আছে?

আমি আবার মাথা নাড়লাম।

ও তাড়াতাড়ি বলল, মুখী কোথায়?

আমি অস্ফুটে বললাম, বাইরে।

পরমুহূর্তে সুশান্ত দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল। তারপর আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে সোজা শোবার ঘরের দিকে চলল।

আমি হাত-পা ছুড়তে লাগলাম, মুখে অস্ফুটে বলতে লাগলাম, না, না; এই না। আমার মুখ সুশান্তর বুকের কাছে ছিল। সুশান্ত কী সাবান মাখে জানি না, ওর বুকের লোম থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছিল। আমি হাত পা ছুঁড়ছিলাম, মেয়েসুলভ ন্যাকামি করছিলাম, যেরকম ন্যাকামি আমরা অন্য মেয়েদের মধ্যে দেখলে ধিক্কার দিই; ঠিক সেই রকম ন্যাকামি। আসলে আমরা সব মেয়েরাই বেসিকালি ন্যাকা—আর আমরা জানি যে পুরুষরা, সব পুরুষরা, সব পুরুষই সময় বিশেষে এই ন্যাকামি দারুণ পছন্দ করে।

সুশান্তর নাকের পাটাটা ফুলে উঠেছিল। ওর গরম প্রশ্বাস পড়ছিল আমার মুখে। সুশান্ত অবুঝ হয়ে গিয়েছিল।

আমাকে খাটের ওপর এনে শোওয়াবার পর এত অবিশ্বাস্য কম সময়ের মধ্যে পুরো ব্যাপারটা এমন অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের মধ্যে ঘটে গেল যে আমি ভাবতেও পারিনি।

আমার লজ্জানত আমার মধ্যে একটা অন্য আমি বাস করে। তাকে আমি এতদিন চিনতে পারিনি। সেই লজ্জানত আমার মধ্যে থেকে এক অদ্ভুত লজ্জাহীন আমি জেগে উঠেছিলাম, আমার শরীরের অণু-পরমাণু, আমার শিরায়-শিরায় এক দারুণ উদ্দীপনা সবে জেগেছিল, আমি এক প্রলম্বিত আনন্দের জন্যে নিজেকে অনেক ঘণ্টা ধরে তৈরি করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম সুশান্তর এই রোমান্টিক চড়ুই পাখির সোহাগ আমাকে ভীষণভাবে অস্থির করে তুলেছে মাত্র। আমার মধ্যে এক দারুণ আগুন জ্বলে উঠেছে—তাকে নেবানো আমার একার পক্ষে অসম্ভব। আমার পাগল-পাগল লাগছিল। কেমন লাগছিল তা বোঝাতে পারব না।

সুশান্ত বিছানার এক কোনায় শুয়ে ছিল মুখে হাত ঢেকে, ওর নিজের একার স্বার্থপর আনন্দে বুঁদ হয়ে। ওকে দেখে আমার সেই মুহূর্তে ঘেন্না হচ্ছিল। ও শুধু নারী শরীরকে জাগাতেই জানে, ঘুম পাড়াতে জানে না।

আমি জানতাম যে ও অনভিজ্ঞ। তাই ওকে প্রথমবার ক্ষমা করে দিলাম আমি। অনেকক্ষণের যতির পর সুশান্ত, আমার আনাড়ি খেলোয়াড়, আমার পেলব বেলাভূমিতে খেলতে নামল, কিন্তু আবারও ও ব্যর্থ হল।

আমি ভরা শ্রাবণের কদম্বগন্ধী কোনো বানের ভরসায় আমার নরম নৌকো ভাসিয়েছিলাম—অনেক প্রত্যাশা নিয়ে। কিন্তু জোয়ার এল না, পালে হাওয়া লাগল না; আমার সমস্ত নৌকোখানি শুকনো চড়ার গ্লানির মধ্যে, নোঙর করাই রইল। সুশান্ত নৌকো বাইতে জানে না, হাল ধরতে জানে না, কোন্‌দিকে স্রোত, কোন্‌দিকে জোয়ার ও কিছুরই খোঁজ রাখে না।

বারেবারে ও ব্যর্থ হল।

আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, সুশান্তদের দূর থেকে অ্যাড্‌মায়ার করা যায়, ওদের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা করা যায়, নন্দনতত্ত্ব, দর্শন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কিন্তু ওদের নিয়ে জীবনে সুখী হওয়া যায় না। রমেন এবং সুশান্ত কেউই আমাকে সুখী করতে পারেনি, পারবেও না। প্রথমজন তার ক্রুডনেসের জন্যে, তার ভণ্ডামির জন্যে, তার নোংরা প্রস্তাবনার জন্যে, আর অশোভনতার জন্যে, দ্বিতীয়জন তার বাড়াবাড়ি রিফাইনমেন্টের জন্যে, তার ইনডায়রেক্টনেসের জন্যে। জীবনের মধ্যে একজনের পায়ে শুধু ভালো ও জোরালো শট আছে—কিন্তু সে ড্রিবল্ করতে জানে না, তার স্টাইল নেই। অন্যজন শুধু স্টাইলসর্বস্ব, তার পায়ে জোর নেই, গোলের সামনে এসেও গোল করতে পারে না সে।

সুশান্তর একটা হাত আমার কোমরের ওপর রাখা ছিল। সুশান্ত পাশ ফিরে শুয়েছিল। ও নিজের আনন্দে নিজে মগ্ন হয়েছিল।

সুশান্তর চোখের উজ্জ্বলতার মধ্যে আমি এক দারুণ স্বার্থপরতার আগুন দেখছিলাম। ওকে আমি ইতিমধ্যেই ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছিলাম।

হঠাৎ কে যেন দরজায় ধাক্কা দিল, তারপর কে যেন কলিং বেল টিপল জোরে জোরে।

আমরা দুজনেই ভয় পেয়ে উঠে বসলাম।

আমি উঠে বসতেই সুশান্ত কোনো গৃহপালিত জন্তুর মতো আমার খোলা বুকের কাছে উঠে এল।

আমি ওকে ধাক্কা দিয়ে সরালাম।

আবার দরজায় ধাক্কা পড়ল জোরে জোরে।

আমি তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পরে চুল ঠিক করে নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালাম। ভিতর থেকে বিরক্তির গলায় বললাম, কে?

ওপাশ থেকে কে যেন জড়ানো গলায় বলল, আমি।

—আমি কে?

—আমি সেন।

—কী চাও তুমি?

—আমি আপনাকে চাই। আমি শুধু আপনাকে চাই।

আমি দৌড়ে গিয়ে বেডরুমের দরজাটা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিয়ে এসে দরজা খুললাম।

সেন দমকা হাওয়ার মতো ভিতরে ঢুকল। ওর মুখ দিয়ে গন্ধ বেরুচ্ছিল।

সেন হাসছিল, বলল, একটা খুব সুখবর দিতে এলাম। কারখানার পর সোজা এখানে আসছি। না এসে পারলাম না। তাই-ই এলাম।

আমি বললাম, তুমি মদ খেয়েছ?

সেন অপরাধীর মতো মাথা নাড়ল।

আমি ধমকের গলায় বললাম, কেন খেয়েছ? সেদিন না কত কী বলেছিলে, তোমার দায়িত্ব কর্তব্যের কথা? সব ভুলে গেলে? এত তাড়াতাড়ি?

সেন বাইরের দরজাটা ভিতর থেকে ভেজিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জড়ানো গলায় বলল, সে কথা আপনি বুঝবেন না।

তারপরই বলল, আমি বড় কদর্য দেখতে না বউদি? আমাকে দেখলেই আপনার ঘেন্না হয়? তাই না?

কেন জানি না, আলোর নীচে দাঁড়িয়ে সেনের সেই কুৎসিত অথচ সরলতামাখা মত্ত মুখের দিকে চেয়ে আমার ভিতরটা যেন কেঁপে উঠল। ভয় পেয়ে গেলাম আমি। বললাম, ঘেন্না করি না; ঘেন্না করব কেন?

সেন অনুনয়ের সঙ্গে বলল, তাহলে আমার কাছে একটু আসুন বউদি, আমার সামনে একটু আসুন, আপনাকে একটু ভালো করে দেখি। একটা দারুণ ভালো খবর দিই আপনাকে।

আমি ধমকের সুরে বললাম, না! কেউ এসে পড়বে। ওরকম কোরো না।

সে অনুনয় করে বলল, প্লিজ, বউদি প্লিজ।

আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সেন বড় যত্নে, বড় আদলে, বড় সাবধানে আমার মুখটা ওর দু'হাতে নিল।

আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, এক অবরুদ্ধ, অশ্রুরুদ্ধ শিশুসুলভ কামনা ওর সমস্ত শরীরময় থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে।

সেন অনেকক্ষণ ওর রুক্ষ হাতে আমার নরম মুখটা ধরে রইল। তারপর যেন ওর সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল, সেদিন ওকে যে অপমান করেছিলাম সে কথা মনে পড়ে গিয়ে যেন ও কুঁকড়ে গেল। ও বোধহয় আমাকে চুমু খেতে চেয়েছিল, বোধহয় এক মুহূর্তের জন্যে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল, কিন্তু মত্ত অবস্থাতেও নিজেকে ও সামলে নিল। সামলে নিয়ে আমার দুটি হাতের পাতা ওর দুটি হাতে তুলে নিয়ে কী যে উষ্ণতার সঙ্গে তার ঠোঁটে ছোঁয়ালো, কী বলব?

এমন সময় হঠাৎ শোওয়ার ঘর থেকে একটা আওয়াজ হল।

মুহূর্তের মধ্যে সেনের চোখের স্বপ্নময় ভাব বদলে গেল। কী এক বিষাদ ও বিরক্তির ভাবে ওর চোখ ভরে গেল। ও আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, ও ঘরে কে? রমেনদা কি ফিরে এসেছে?

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, কেউ না। বিড়াল-টিড়াল হবে।

সেন হঠাৎ আমার মুখের দিকে একাগ্রভাবে চেয়ে বলল, আপনার চুল এলোমেলো কেন? ও ঘরে কে?

আমি রাগের গলায় বললাম, কী পাগলের মতো বকছ। কিন্তু আমার বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে গেল। আমি ওর হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বললাম, এসো, তোমার কী চাই বলো আমার কাছ থেকে। কী চাই?

সে ওর পা দুটো ফাঁক করে আলোর তলায় দাঁড়িয়ে এক দারুণ হিমেল হাসি হাসল আমার মুখে চেয়ে। বলল, কিছু চাই না। আমার কিছুই চাই না।

বলেই ধীরে ধীরে ও বেডরুমের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

আমি চিৎকার করে বললাম, কী হচ্ছে কী?

সেন আমার কথায় কর্ণপাত করল না।

এগিয়ে এক ঝটকায় বেডরুমের দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলল।

আমিও ওর পিছনে পিছনে গেলাম। আমার মাথার ঠিক ছিল না। আমি বুঝতে পারছিলাম না, আমি কী করব, কী আমার করা উচিত।

বেডরুমে বেডলাইটা জ্বলছিল। খাটের বেডকভারটা লণ্ডভণ্ড অবস্থাতেই ছিল।

হঠাৎ সেন থমকে দাঁড়াল।

সেনের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও দেখলাম, মেঝেতে সুশান্তর চটি-জোড়া পড়ে আছে এবং আমার ও রমেনের জোড়া ওয়ারড্রোবের দরজার ফাঁক দিয়ে সুশান্তর পাঞ্জাবির কোনার কিছুটা বেরিয়ে আছে।

সেন আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি মুখ নামিয়ে নিলাম। সেদিন আমি ওকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম; আজ ওর দিন।

সেন বলল, বিড়ালটার চেহারা দেখব নাকি?

আমার বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ করছিল। আমি ওর দিকে অপরাধীর চোখে তাকালাম।

সেন তেমনি জড়ানো গলায় বলল, না। থাক। ছিঁচকে মেনি বিড়ালের মুখ অন্ধকারেই থাক। ও মুখে আলো না পড়াই ভালো।

আমাদের কথাবার্তা সুশান্ত নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছিল, কিন্তু সুশান্ত কোনো কথা বলল না, ভেতর থেকে বেরিয়েও এল না।

হঠাৎ সেন ঠাস্ করে আমার গালে একটা চড় মারল।

আমার মাথাটা ঘুরে গেল। ওর পাঁচ আঙুলের দাগ আমার গালে গভীর হয়ে বসে গেল।

ওর গলার জড়ানো ভাব কেটে গেল। ও যেন হঠাৎ আমার চেয়ে, রমেনের চেয়ে, সুশান্তর চেয়ে, অনেক বড় হয়ে গেল। ও স্পষ্টভাবে কেটে কেটে বলল, নিরুপমা, আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। রমেনদার মতো নয়, তোমার এই বিড়ালের মতো করেও নয়, আমার সবকিছু দিয়ে। যা কিছু আমার ছিল বা আছে বা হবে তার সবকিছু দিয়ে।

তারপর একটু থেমে বলল, তোমাকে আমি যেখানে বসিয়েছিলাম মনে মনে, তুমি সেখানে বসার যোগ্য নও। তুমি আমার ভালোবাসা পাবার যোগ্য নও।

এই বলেই সেন সোজা দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। তারপর দু গাল বেয়ে দরদরিয়ে জল পড়তে লাগল। আমি দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরে খাটের কোনায় বসে পড়লাম।

সেন আমাকে বউদি বলে ডাকত। সেন, আজকে আমার সঙ্গে এক অদ্ভুত ব্যবহার করে গেল। এমন ব্যবহার করল ও, এমন দ্বিধাহীনতায় আমাকে চড় মেরে গেল যে, আমার সমস্ত পুরোনো মরচে পড়া জানা, আমার সমস্ত বোধ, ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠল।

আমি কতক্ষণ যে অমন ভাবে বসেছিলাম, আমি জানি না।

অনেকক্ষণ পর ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ করে আলমারির দরজা খুলল। ভেতর থেকে সুশান্ত চোরের মতো ভয়ার্ত মুখ বের করে ফিস্‌ফিস্‌ করে জিজ্ঞেস করল, চলে গেছে?

আমি জবাব দিলাম না।

আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম। কাঁদতে কাঁদতে আমাকে, আমার অভিশপ্ত জীবনকে, আমার অল্প বয়সের দম্ভকে, অভিশাপ দিচ্ছিলাম।

সুশান্ত আবার মুখ বের করে বিরক্তির গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, বলো না? চলে গেছে কিনা?

আমি তবুও জবাব না দেওয়াতে ও আলমারি খুলে বেরোলো। চটি দুটো পরল। তারপর আমার দিকে একবারও না চেয়ে, আমার চড়-খাওয়া গালের দিকে একবারও না তাকিয়ে বলল, আমি চলি, আবার হয়তো কে এসে পড়বে, বলেই হন্‌ হন্‌ করে বেরিয়ে চলে গেল।

চলে যাওয়া সুশান্তর দিকে তাকিয়ে ওর সমস্ত কিছুর জন্যে এক দারুণ ঘৃণায় আমার শরীর ঘিন্‌ ঘিন্‌ করে উঠল। ওকে আমি যা দিয়েছি তা আর ফেরানো যাবে না। কিন্তু ওকে আমি ভুল করে তা দিয়ে ফেলেছি বলে, আমার নিজের ওপরও এক অদ্ভুত ঘৃণা হতে লাগল। আমার মন কেবলই বলতে লাগল যে, আমার বুঝি সব কিছুই এমনি করে হারিয়ে যাবে, যা কিছু আমার ছিল, আমার বলতে যাই-ই ছিল; সব। সব; সব।

১২

আজ কুড়ি দিন হল রমেন কলকাতা গেছে। আজ অবধি তার কোনো চিঠি আসেনি আমার কাছে। বাবার আর একটা চিঠি পেয়েছিলাম তাতে উনি লিখেছিলেন যে পরমেশ কাকা রমেনকে পরের সপ্তাহে রেসেব মাঠে দেখেছেন।

এতদিনে আমার যা বোঝার ছিল, সবই বোঝা হয়ে গেছে। বুঝতে যে কষ্ট হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনো, কিন্তু তবুও বুঝতে হয়েছে। রমেন আমাকে সব দিক দিয়ে, সর্বতোভাবে নিঃস্ব রিক্ত করে গেছে। আমি তো এমনিতেই নিঃস্ব ছিলাম, কিন্তু বার বার ওকে সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও, ওকে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও কেন যে নিজেকে বার বার এত ভাবে ছোটো করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল সেটাই আমার বুদ্ধির বাইরে।

গতকাল থেকে আমি কেবলি ভাবছি, ভাবছি কী করা যায়। কী আমার করা উচিত।

সুশান্তর মধ্যের মেয়ে মানুষটা সেদিন সব দিক দিয়ে এমনভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল আমার কাছে, আমার চোখের সামনে, যে তারপর থেকে সুশান্তর সঙ্গে আর কোনোরকম সম্পর্ক রাখার ইচ্ছা ছিল না। অথচ ওর সবই ছিল। শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, সভ্যতা, এমনকি সততাও ছিল। অথচ তবুও এমন এক পরীক্ষায় ফেল করল, এমন এক স্বার্থপরতাময় জগতের আভাস দেখতে পেলাম ওর মধ্যে যে ওকে আর আমার ভালো লাগা সম্ভব নয়। আশ্চর্য! সুশান্তর ওপর মনে মনে আমি

অনেকখানি নির্ভর করতে শুরু করেছিলাম। কতখানি যে, তা সুশান্ত নিজেও জানে না।

আমার জীবন হয়তো কারও অভিশাপে অভিশপ্ত হয়ে গেছে। নইলে যাতেই আমি হাত দিই, যাকেই আমি আপন করে পেতে চাই, সেই কেন এমনভাবে ব্যর্থ করে নিজেকে ও আমাকে?

গত সপ্তাহ থেকেই বর্ষা নেমেছে জামশেদপুরে। গরমটা অনেক কম। গাছে-গাছে ক্ষুদে-ক্ষুদে কচিকলাপাতা রঙা নতুন পাতা গজিয়েছে। কদ্‌মা-সোনারি লিংক্‌সের শুকিয়ে-ওঠা রুক্ষতার মধ্যে এখন নতুন নতুন ঘাস গজিয়ে উঠেছে। সোনাঝুরি গাছগুলোর পাতাগুলো রোদ পড়লে চক্‌চক্ করে। এখানকার শান্ত নিস্তব্ধ ঠান্ডা দুপুরগুলো ভারী ভালো লাগে।

বাইরের প্রকৃতি শান্ত স্নিগ্ধ হয়েছে, কিন্তু আমার অন্তরের প্রকৃতি বড়ই বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে। অথচ খুব তাড়াতাড়ি আমায় একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ রমেনের কলকাতায় পাকাপাকিভাবে থেকে যাবার কথাটা আমাদের বাড়িতে আর বেশিদিন চাপা থাকবে না। হয়তো বাবা অথবা কোনো দিদি জামাইবাবুকে আমাকে না জানিয়েই ব্যাপারটার সরেজমিনে তদন্ত করতে এসে হাজির হবেন এখানে ঝুপ করে। তাই যদি হয়, তাহলে এতদিন আপ্রাণ চেষ্টায় যে সত্যটাকে গোপন রেখেছিলাম, সেই হঠাৎই ফাঁস হয়ে যাবে, বড় মর্মান্তিকভাবে।

জানি না কেন, কিছুদিন থেকে, মানে সেনের আমাকে চড় মারার পর থেকেই সেনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছিল। রমেন আমাকে ভালোবাসেনি, সুশান্ত আমাকে তার নিজের সংকীর্ণ মেনিবিড়ালের ভালোবাসায় ভালোবেসেছিল, সে ভালোবাসা আমার গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। তবে কী ঐ কুদর্শন ছেলেমানুষ সেনই আমাকে সত্যিকারের ভালোবাসে? তাকেই কী আমার এই জটিল মনের কোনো অবচেতন কোণে আমি আসন দিয়েছি আমার অজ্ঞাতসারে? অতীতের কোনো অজানা মুহূর্তে? এও কি সম্ভব?

কী জানি? আগে ভাবতাম আমি কত বুঝি, কত জানি। ভাবতাম, বাবা, মা, দাদা, দিদিরা সব সব ব্যাক-ডেটেড্, প্রি-হিস্টোরিক ফসিল। ভাবতাম, আমি যা জানি, আমি যা বুঝি সেটাই ঠিক। অন্যরা সকলেই ভুল। তখন আমার নিজের উপর পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল—নিজেকে, নিজের বিচার-বুদ্ধিকেই একমাত্র বিশ্বাস করে অন্য সকলকেই অবহেলায় অবিশ্বাস করেছিলাম।

আজ আমার স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা বা লজ্জা নেই যে, আমার সেই এককালীন কংক্রিটের বিশ্বাসের ভিত আজ বড় নড়বড়ে হয়ে গেছে। নিজের ওপর আগের মতো নির্দ্বিধায় ভর করার সাহস আমার নষ্ট হয়ে গেছে।

আমার এই অল্পবয়সি জীবন, আমার সুন্দর শরীর এবং সরল অপাপবিদ্ধ মন এমন, এমন সব অসততা, ছল চাতুরী প্রবঞ্চনার মধ্যে দিয়ে গত দুবছর পার হয়েছে যে একটা পরম সত্য বড় মর্মান্তিকভাবে বুঝেছি। দুঃখ এইটুকুই যে এ সত্য বোঝার জন্যে বড় বেশি দাম দিতে হল। বুঝেছি যে, জীবনের কোনো জানাই, কোনো বিশ্বাসই, কোনো বোধই স্থাবর নয়। জীবন যেমন নদীর মতো বহমান, তেমন বহমান আমাদের সব বিশ্বাস, সব জানা, সব বোধ। গতকাল যেটাকে সত্য বলে জেনেছি, আজকেই সেটাকে মিথ্যা বলে জানছি। গতকাল যে নির্ভুল বলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেছি, আজকে সেই বিশ্বাসের অযৌক্তিকতাতে নিজেরই হাসি পেয়েছে।

এ কথা সত্যি যে আমি হেরে গেছি। নিজের কাছে নিজে বারবার হেরে গেছি—তবু বাইরের কারও কাছে আমি হারিনি, হারতে চাইনি কখনও। বাইরের কারও কাছে এখন অবধিও হারিনি। জানি না আমার কপালে কী আছে। আধুনিকই হই আর লেখাপড়ই শিখি, কপাল অতিক্রম করার কোনো শক্তি আমার আছে বলে আমি মনে করি না।

এখন বারে বারেই মনে হয় মেয়ে হয়ে-জন্মানো, সুন্দর নারীশরীর নিয়ে জন্মানো যেমন এক

দারুণ আশীর্বাদ, তেমন এক দারুণ অভিশাপও বটে। আমার সুন্দর শরীর না থাকলে রমেন আমার প্রতি আকর্ষিত হত না। নইলে রেসের মাঠের কিম্ভূতকিমাকার নামের অনেক ঘোড়ার মতো একটি ঘর্মাক্ত ঘোড়ার মতো ও আমাকে বেছে নিয়ে আমার উপর বাজি লাগাত না। জানি না, আমাকে বিয়ে করা নিয়েও ও কারও সঙ্গে ভাও লাগিয়েছিল কি না। রেসে জেতার পর যেমন জুয়াড়িদের যে ঘোড়া তাকে জেতাল সে সম্বন্ধে আর কোনো ঔৎসুক্য থাকে না—তেমন বিয়ের পর আমার সম্বন্ধেও আর কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। যা ছিল, তা নিরুপমা চৌধুরি নামের মেয়েটির প্রতি কোনো বোধই নয়, তার সুন্দর শরীরটার প্রতি এক অদ্ভুত লোভ। যা কেবল পুরুষদেরই একচেটে। পুরুষদের চাওয়া, বড় নোংরা চাওয়া।

মন বিবর্জিত, মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকাজহীনতার মধ্যে রমেন শুধুই একটি ভালো-ফিগার মিষ্টি-মুখের শরীর চেয়েছিল। এখন বুঝি, আজ বুঝি, ও আমাকে আমার জন্যে কখনও চায়নি।

রমেনের পরে আমার এই আশ্চর্য অভিশপ্ত জীবনে এল সুশান্ত—রূপকথার রাজপুত্রের মতো। ভাবলেও অবাক লাগে। সুশান্ত সম্বন্ধে মনে মনে কত না কল্পনার ছবি এঁকেছিলাম। আমি যা চাই, আমি যা স্বপ্ন দেখেছি সবই সুশান্তর মধ্যে দেখতে পেতাম। এখনও আমার ভাবতে কষ্ট হয় যে, এতদিন ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা মানসিকতা কেমন এক মুহূর্তের একটা ঘটনায় মাকড়সার জালের মতো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

শারীরিক ব্যাপারে সুশান্তর অক্ষমতা একটা বড় ব্যাপার হলেও সেটা কিন্তু আমি কখনও বড় করে দেখতাম না। আমার মনে হয়, কোনো মেয়েই দেখে না। হাজার হাজার সুখী মেয়ে আছে যারা এ বাবদে সুখী নয়, সুখী হয়নি। কিন্তু তাদের স্বামীরা তাদের আরও এমনকিছু জীবনে দিয়েছে যে তারা এইদিকের অপূর্ণতা অনায়াসে ভুলে গেছে। সেই অন্য অনেক কিছু বলতে যে শুধু টাকা-পয়সাই পড়ে তা নয়। টাকা-পয়সা, সচ্ছলতা এসব ভীষণ দরকারি; কিন্তু এর চেয়েও বড় জিনিস চাইবার থাকে আমাদের পুরুষদের কাছ থেকে। কথাটা কী করে বোঝাব জানি না। হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেলে, যখন ঝুপ করে অন্ধকার হয়ে আসে, ঝড়ের রাতে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে যখন বুকের মধ্যে চমক দিয়ে বাজ পড়ে, অতর্কিতে যখন খাটের তলা থেকে কুৎসিত আরশোলা ডানা মেলে ফর্‌র্‌-র-র্‌ ফর্‌র্‌-র্‌-র্‌ করে ঘরময় উড়ে বেড়ায়, ঠিক তখন, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি বা অন্য যে-কোনো মেয়ে যার দিকে দৌড়ে যাই, যার হাতে হাত রাখতে চাই, সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে, নিজেদের দেশি-বিদেশি য়্যুনিভার্সিটির ডিগ্রি, আমাদের সব ইন্ডিপেনডেন্স ও লিবারেশনের গুমোর ভুলে গিয়ে আমরা যাদের বুকে আছড়ে পড়ে যাদের ওপর নিঃশর্ত নির্ভরতায় নির্ভর করি—একমাত্র তারাই তা দিতে পারে; যা মেয়েরা চায়।

শীতার্ত দিনের উষ্ণতা, অন্ধকারে আলো, অনিশ্চয়তার মধ্যে নিশ্চয়তা এবং আমাদের কাছে সবচেয়ে যা বড়, সেই অন্তরের অনাবিল অবলম্বন যে পুরুষ দিতে পারে, মেয়েরা তাকেই পুরুষ বলে মানে। তাকেই তার নরম শরীরে, তার ভঙ্গুর কম্পমান মনে আদর করে বরণ করে নেয়।

এত কথা মনে হচ্ছে এই জন্যেই যে, সুশান্তর আচরণে, তার চোরের মতো আসা, ধরাপড়া এবং চোরের মতো পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে এমন এক কাপুরুষতা ছিল, এমন এক বিশ্রী ব্যাপার ছিল যে, তার সেই ক্ষণিকের ব্যবহার, তার আগের এতদিনের ছবি আমার কাছে একেবারে মলিন করে দিল। ও মলিন হয়ে গেল সেনের পটভূমিতে। হঠাৎ করে আবিষ্কার করে বসলাম আমি যে, যে লোকটা কাউকে, নিছক ভালোবাসার দাবিতে, বিনাভূমিকায়, বিনা আড়ম্বরে ঠাস্‌ করে চড় লাগাতে পারে—আর যাই-ই হোক সে লোকটার মধ্যে মেকীর কিছু নেই। এ সব লোক কথায় কথায় রবার্ট ফ্রস্ট বা টি. এস. এলিয়ট বা জীবনানন্দ আওড়ায় না, এরা আধুনিক ফিল্‌ম-এর ওপর অথরিটি

বলে নিজেদের দাবি করে না, এরা পৃথিবীর তাবৎ শিল্পবোধ ও রুচিজ্ঞানকে এদের সিগারেট ধরা আঙুলগুলির মধ্যে বন্দী করে রেখেছে বলে বিশ্বাস করে না—এরা সাদা-মাঠা লোক—এরা কেউ ইঞ্জিনিয়র, কেউ কেরানি, কেউ পিওন, কেউ ডাক্তার—কিন্তু এরা একটা বাবদে সমান—তাদের বিদ্যা বুদ্ধি পেশা বৃত্তি যাই-ই হোক না কেন—এরা নিজেদের ওপর, এদের প্রত্যেকে নিজের নিজের ওপর বিশ্বাস রাখে। এদের প্রত্যেকের আত্মবিশ্বাস আছে।

আমি নারীজাতির প্রতিনিধি নই, সকলের কথা আমি জানি না—আমি আমার কথা জানি। এই-ই আমার মত। যে পুরুষের সমস্ত ব্যাপারে তার নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস নেই, সে কাউকে ভালোবাসার শখ রাখে, কিন্তু তার চোখের সামনে তার ভালোবাসার জনকে অন্য লোক মেরে যেতে পারে, তেমন লোককে ভালোবাসা নিরুপমা চৌধুরির পক্ষে সম্ভব নয়।

সুশান্তটা একটা থার্ডক্লাস ফ্লপ্। ও একটা ভণ্ড। রমেনের মতো ক্রুড ভণ্ড নয়; রিফাইন্ড ভণ্ড। এদের উচিত বালিগঞ্জ পাড়ার মেগিয়া-স্লিভস্ ব্লাউজ পরা কোনো বড় লোকের ইন্‌সিপিড ন্যাকুপুষুমুনু মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা। নিরুপমা সুশান্তর জন্যে নয়।

কিন্তু ওকে যা দেবার তা তো দিয়েই দিয়েছি। তার পুনরাবৃত্তি হবে না, কিন্তু তা তো আর ফেরানোও যাবে না।

মনে মনে এত কথা বললাম বটে, কিন্তু কখনও-সখনও সুশান্তর কথা ভেবে মনটা একটু একটু খারাপও হচ্ছিল। ওর টানা-টানা কালো চোখ দুটি আমার চোখের সামনে ভাসছিল। তারপর মনে মনে নিজেই নিজেকে বললাম, দুপুরবেলায় খোঁটায় বাঁধা গোরুদের চোখও তো ওরকম হয়।

আমি জানি না আমি কী করব? নিরুপমা চৌধুরি আর কতবার, কতবার, কতবার এমন করে ভুল করবে? প্রতি পদে পদে কতদিন নিজের জীবনটাকে এমন হোঁচট খাওয়াতে খাওয়াতে এগিয়ে নিয়ে যাবে—আর কতদিন। নিরুপমা, তুমি কি চিরদিন ভুলই করবে? চিরটা দিন; চিরটা কাল?

সেনের ভাবনাটা আমাকে আজ দুপুর থেকে ভীষণ পেয়ে বসেছিল। সেনের ঠিকানা আমাদের ঠিকানার খাতায় লেখা ছিল। দু'বার সেই ঠিকানাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম। কী করব বুঝতে পারলাম না। জীবনে এমন এমন সময় অনেক আসে যখন কী করব বা কী করা উচিত তা কেবল নিজেকেই ঠিক করতে হয়। নিজের পাশে দাঁড়াবার, বুদ্ধি দেবার মতো কেউই থাকে না তখন। আমার স্কুলও খুলে এল বলে। রমেন যদি সত্যিই আর না ফিরে আসে তাহলে আমার কোনো হস্টেলে গিয়ে উঠতে হবে। একা আমার পক্ষে এরকমভাবে থাকা সম্ভব নয়। কোনোও দিক দিয়েই নয়। তারপর বুঝে-সুঝে কলকাতাতেই চলে যেতে হবে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে।

আজ কখন যে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সেনের ঠিকানার দিকে বেরিয়ে পড়েছিলাম সন্ধের মুখে, আমি নিজেই জানি না। যখন সাইকেল রিকশা নিয়ে নিয়ে ঠিকানা চিনে পৌঁছলাম তখন সন্ধে সাতটা। সেনকে পাওয়া গেল না, একজন মাদ্রাজি ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এসে বললেন যে, সেনসাহেব নতুন বাসায় উঠে গেছেন তাঁর চাকরিতে উন্নতি হয়েছে বলে। ভদ্রমহিলা সেই নতুন বাসার ঠিকানাই দিলেন।

অনুমানে বুঝলাম যে, ভদ্রমহিলার স্বামী রমেনদের কারখানাতেই কাজ করেন। আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করাতে আমি বললাম, আমি সেনের কাজিন হই।

সেই নতুন ঠিকানা অনেক দূর এখান থেকে—পশ্ পাড়ায়। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। একবার ভাবলাম বাড়ি ফিরে যাই, আর একবার ভাবলাম, না এখনই যাই ওর কাছে।

তারপর রিকশা ঘুরিয়ে নিয়ে এগোলাম নতুন ঠিকানার দিকে।

এ ক'দিন দিন-রাত ভাবনা-চিন্তায় আমার শরীরটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল—চোখ বসে গিয়েছিল—খাওয়া-দাওয়ারও অনিয়ম হয়েছে খুব—রাতে প্রায় বেশিরভাগ দিনই খাইই নি কিছু। ঘুমোতেও পারিনি।

রিকশাটা গিয়ে যেখানে দাঁড়াল সেটা রীতিমতো বড়লোকি জায়গা।

রিকশাওয়ালাকে দাঁড় করিয়ে রেখে, ওর বাড়ির পাশের একটা পানের দোকানের আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নিলাম। এ ক'দিনে একেবারে হতশ্রী হয়ে গেছি আমি। আমাকে চেনা যায় না একেবারে! কিন্তু উপায় নেই—সেনের সঙ্গে একবার দেখা করা আমার বড় দরকার। নিজেকে বোঝার জন্যে। ওকে বোঝার জন্যে।

দরজার কলিং বেল টিপলাম।

বেয়ারা এসে দারুণ সাজানো-গোছানো একটি ড্রইং রুমে এনে আমাকে বসাল। বলল, সাহাব আভি কারখানাসে আয়া। আপ তসরীফ্ রাখিয়ে। উনোনে নাহানে গ্যায়া।

আমি বললাম, ঠিক হ্যায়।

ব্যাপারটা আমার একটু অবাক অবাক লাগছিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যে কারখানায় সেনের এমন কী উন্নতি হল যে ঐ বাড়ি থেকে একেবারে এই বাড়িতে উঠে এল? হঠাৎ মনে হল, ভুল ঠিকানায় আসিনি তো! লোকটিকে আবার ডেকে ভালো করে শুধোলাম, সেনের নাম, সেনের কোম্পানির নাম।

সব ঠিক ঠিক মিলে গেল।

ড্রইং রুমটার চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। একটি বড় সোফা সেট, একটা গ্লাস-টপ দেওয়া গোল সেনটার টেবল্—। মেঝেতে হালকা সবুজ রঙা কার্পেট। চতুর্দিকে সাচ্ছল্যর সঙ্গে সুরুচির ছাপ পরিষ্কার। আমার বড় ইচ্ছা ছিল এমন একটা বসবার ঘর থাকুক আমার। বড় ইচ্ছা ছিল। রমেনকে নিয়ে আমি যা যা স্বপ্ন দেখতাম, তার মধ্যে এও একটা স্বপ্ন।

বসে বসে ভাবছিলাম, সেনও রমেনের মতোই ইঞ্জিনিয়ার। তবে পড়াশোনায় সেন খুব ভালো ছিল, রমেনের কাছে শুনেছি আমি। হয়তো ভালো করে কাজ করেছে, সৎভাবে খেটেছে, হয়তো ফাঁকি দেয়নি। রমেনদের কোম্পানি সরকারি নয়; খুব বড়ও নয়, তাই এখনও যোগ্যতার ও সততার দাম আছে এ সব জায়গায়।

এত সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ভিতরের প্যাসেজ থেকে চটির আওয়াজ শুনতে পেলাম।

সেন পায়জামা আর আদ্দির পাঞ্জাবি পরে পর্দা সরিয়ে ঘরে এসে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল? পর্দার সামনেই দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ ও।

তারপর থতমত খেয়ে বলল, তুমি! আপনি! কী মনে করে?

আমিও উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু আমি কিছু বলতে পারলাম না। বললাম, এমনিই। কোনো দরকার নেই। এমনিই।

সেনের দিকে তাকিয়ে সেনকে যেমন ও যতখানি কুৎসিত দেখাত আগে, ততখানি দেখাল না। মনে হল, যে ছেলেটির মোটর সাইকেলের পিছনে বসে আমি বেড়াতাম, এ সে নয়। এ অন্য কেউ। সেই সাবালক ছেলেমানুষ কবে যেন সাবালক বীরপুরুষ হয়ে গেছে। পুরুষমানুষদের কৃতিত্বর পটভূমিতে তাদের বিচার করলে, তাদের চেহারাটা মানে চোখ মুখ নাক গায়ের রঙ বোধ হয় আলাদা করে চোখে পড়ে না; যা চোখে পড়ে তা বোধ হয় তাদের ব্যক্তিত্ব। কেন জানি না, যেদিন আমাকে সেন চড় মেরেছিল, সেদিনও ওর চেহারাটা খুব ব্যক্তিত্বময় বলে মনে হয়েছিল আমার।

অনেকক্ষণ আমি সেনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সেন যেন আদেশের সুরে বলল আমায়, বোসো।

তারপরই বলল, তোমাকে তুমিই বলছি, কারণ বয়সে তুমি আমার চেয়ে সামান্য ছোটই হবে। রমেনদার সম্পর্কে তুমি আমার বউদি হতে—সে সম্পর্কটা যখন আমাদের কেউই আর মানি না তখন তোমাকে তুমি বলার কোনো বাধা দেখি না।

আমি বসে পড়লাম।

সেন বলল, তুমি কিছু খাবে?

আমি বললাম, না।

না কেন?

ও এ কথাটাও আদেশের সুরে বলল।

আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। বললাম, শুধু চা।

সেন বেয়ারাকে ডেকে বলল, সিরিফ চায়ে লাও। আর কিছু যে আনতে বলল না, তা আমি লক্ষ্য করলাম।

তারপর বলল, রমেনদার খবর জানো?

আমি মাথা নাড়লাম।

তুমি কি আমার কাছে তার খবর জানতে এসেছ?

আমি আবার মাথা নাড়লাম।

ও বলল, তাহলে কেন এসেছ? এসেছ কেন?

আমি বললাম, জানি না।

আমি মুখ নিচু করে রইলাম।

পরমুহূর্তেই আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার দু চোখ জলে ভরে গেছে।

সেন আমার দিকে অপলকে তাকিয়ে ছিল। শুকনো চোখে। ওর চোখে অনুশোচনা, সমবেদনা বা বিস্ময় কোনো কিছুই ছিল না। ফারনেসের পাশের হাওয়ার মতো ওর চোখ দিয়ে এক আশ্চর্য গরম হল্‌কা বেরোচ্ছিল। ওর চোখে কোনো ভাবালুতা ছিল না।

সেন আমার সঙ্গে কোনো কথা বলল না। সমস্তক্ষণ শুধু আমার চোখে চেয়ে রইল।

একটু পরে বেয়ারা ম্যাটস্-পাতা ট্রেতে বসিয়ে, সুন্দর টি-কোজিতে ঢাকা টি-পটে চা নিয়ে এল।

সেন উঠে এসে আমার পাশে বসল। নিজে হাতে চা ঢালল। তারপর বলল, চিনি কতচামচ।

আমি বললাম, এক।

সেন চা তৈরি করে আমাকে এগিয়ে দিল।

আমি বললাম, তোমার?

ও আবার নিজের জায়গায় গিয়ে স্বগতোক্তির মতো বলল, সারাদিন কারখানায় থেকে শরীর এত কষে যায় যে কিছু ভালো লাগে না।

আমি বললাম, একটা করে বিয়ার খাও না কেন? ফিরে এসে? গরমের দিনে?

সেন অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে।

তারপর বলল, কে আনায়? কে দেয়? নিজের জন্যে কখনও কিছু করিনি ছোটোবেলা থেকে, অভ্যাস নেই, ভালোও লাগে না।

আমি কথা বললাম না আর।

কিছুক্ষণ পর আমি বললাম, উঠি।

সেন বলল, বেশ। বলে উঠে দাঁড়াল। একবারও বলল না আবার এসো, বলল না যে ও খুশি হয়েছে! বলল না আর একটু বোসো।

ও দরজা অবধি এসে দরজা খুলে দিল।

দরজা খুলতেই দেখি একটা সাদা স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির পাশে কোম্পানির নীলাভ য়্যুনিফর্ম পরা ড্রাইভার।

ড্রাইভার এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল আমার জন্যে।

সেন বলল, মেমসাব রিকশাসে যায়েগী—তুম্ গাড়ি গ্যারাজমে লাগা দেও।

রিকশাওয়ালা একটু দূরে দাঁড়িয়েই ছিল। আমাকে দেখে এগিয়ে আসতে লাগল।

এমন সময় সেন আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, এটা ভদ্রলোকের পাড়া এখানে বাজারের মেয়েরা যাওয়া-আসা করে না। এমন করে আর এসো না, বুঝলে।

আমার কান দুটো গরমে ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। ওর দিকে না তাকিয়ে, ওকে কিছু না বলে আমি রিকশায় উঠে বসলাম।

রিকশাওয়ালা রিকশা চালিয়ে দিল।

একবার পিছন ফিরে দেখলাম সেন দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখে তখনও সেই শুকনো আগুনের হল্কা। মুখে কোনো ভাব নেই। ভাবলেশহীন কঠিন আত্মমগ্ন মুখ।

সেদিনও রাতে আমার খাওয়া হল না। রাত তিনটে অবধি বিছানায় ছটফট করলাম আমি। তারপর মনস্থির করে ফেললাম। ঠিক করলাম, কালই সকালের স্টিল-এক্সপ্রেসে কলকাতা যাব। আমাদের বাড়ি গিয়ে উঠব। এতদিনে আমার মাথা উঁচু করে থাকার দিন বুঝি সত্যিই শেষ হয়ে গেছে। যে-বাড়ি থেকে একদিন সানাইয়ের আওয়াজের মধ্যে সকলকে কাঁদিয়ে এসেছিলাম, সে-বাড়িতে কাল দুপুরের রোদে চিলের কান্নার মধ্যে ভীরু পায়ে চোরের মতো ফিরে যাব। বাবার পা জড়িয়ে ধরে বলব, বাবা আমি ভুল করেছিলাম, বলব, বাবা তুমি আমাকে চাবুক মারো, চাবুক মেরে আমার পিঠের চামড়া তুলে দাও।

অন্য মেয়ে হলে হয়তো এ অবস্থায় আত্মহত্যা করত। কিন্তু আমি যে এই সুন্দর পৃথিবীকে বড় ভালোবাসি, আমার এই এক ও একমাত্র জীবনকে যে আমি বড় ভালোবাসি। আমি যেই নিজেকে নিজে হাতে মারতে শিখিনি। মারার কথা ভাবিওনি কখনও। এ জীবনে সকলে কি আমাকে ঠকাতেই এসেছিল? আমার কি এইই প্রাপ্য ছিল পৃথিবীর কাছ থেকে? আর কিছুই কি আমার পাওয়ার ছিল না কারও কাছে?

রাত তিনটে নাগাদ উঠে মুখ-হাত ধুয়ে আমার স্যুটকেসটা গুছিয়ে নিলাম আস্তে আস্তে। আপাতত একটা স্যুটকেস নিয়েই যাই। তারপর দাদা-দিদিদের কারও সঙ্গে ফিরে এসে সব বন্দোবস্ত করব।

ভোর পাঁচটার আগেই অন্ধকার থাকতে থাকতে মুখীকে উঠিয়ে একটু চা করতে বললাম। তারপর আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে মুখীকে পাঠালাম কালীবাড়ির মোড় থেকে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে। মুখী চলে গেলে দরজা বন্ধ করে স্যুটকেস নিয়ে বাইরের ঘরে বসে থাকলাম আমি। আমার অস্পষ্ট অজ্ঞাত ভবিষ্যতের মধ্যে।

এই সময় সুশান্তর কথা আমার ভীষণ মনে হচ্ছিল। ওরও হয়তো দুঃখ হয়েছে আমার জন্যে। ও-ও নিশ্চয়ই ওর মতো করে আমাকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু ও বড় পুঁথি-পড়া বিদ্বান, ও বড় স্বার্থপর, ও বড় ভীরু—ওর মতো ছেলের ওপর জীবনে একবার ভুল করার পরও দ্বিতীয়বার নির্ভর করা যায় না। ওরা দূর থেকে মেয়েদের মন কাড়তে পারে, মেয়েদের সহানুভূতি পেতে পারে; কাছ থেকে নয়। ওদের নিয়ে এক ঘরে বাস করা যায় না। ওরা অন্তরে পুরুষ নয়, ওরা পোশাকি পুরুষ।

কলিং বেলটা বাজল। বাইরে ট্যাক্সি থামার শব্দ হয়েছিল একটু আগে। ট্যাক্সি পেতে মুখীর দেরি হয়নি।

আমি স্যুটকেসটা হাতে করে এসে দরজা খুললাম।

দরজা খুলেই অবাক হয়ে গেলাম।

দেখি, সেন দাঁড়িয়ে আছে—কালকের সন্ধেয় যে পোশাক পরেছিল, সেই এলোমেলো হয়ে যাওয়া পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে।

সেনের চুল উস্কো-খুস্কো, হাতে গাড়ির চাবি। পিছনে ওর সাদা ছিপছিপে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে।

সেন বলল, আমি তোমাকে নিতে এসেছি। আশ্চর্য তুমি যে তৈরি হয়ে আছো? তুমি কি জানতে যে আমি আসব?

আমি অন্যদিকে চেয়ে বললাম, মুখীকে ট্যাক্সি ডাকতে পাঠিয়েছি—। স্টিল এক্সপ্রেসে আমি কলকাতা যাব এখুনি।

সেন দরজাটা ভেজিয়ে দিল। আমার পথ আগলে বলল, তুমি কোথাওই যাবে না; তুমি এখন তোমার নিজের ঘরে যাবে; নিজের সংসারে।

আমি বললাম, পথ ছাড়ো। আমি সারারাত ঘুমোইনি। রসিকতা বোঝার মতো শরীর বা মনের অবস্থা নেই আমার।

সেনের চোখ দুটো আবার কাল রাতের মতো শুকনো হয়ে গেল।

ও বলল, আমিও সারারাত ঘুমোইনি। রসিকতা আমি করছি না। অন্তত তোমার সঙ্গে করিনি কখনও।

ইতিমধ্যে মুখী এসে গেল ট্যাক্সি নিয়ে।

সেন মুখীকে বলল, আমিই পৌঁছে দেব দিদিমণিকে স্টেশনে।

বলেই, আমাকে কিছু বলতে দেবার আগেই পকেট থেকে পার্স বের করে ট্যাক্সি-ওয়ালাকে দুটো টাকা দিয়ে দিল। তারপর গাড়ির বুট খুলে আমার স্যুটকেসটা পিছনে তুলে সামনের বাঁদিকের দরজা খুলে দিল আমার জন্যে। খুলে দাঁড়িয়ই থাকল।

আমি মুখীর দিকে তাকালাম।

মুখী কী বুঝল জানি না। মুখী আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি মুখ বাড়িয়ে বললাম, বাড়ি ছেড়ে যাস না মুখী, সাবধানে থাকিস।

গাড়িটা স্টার্ট করেই সেন বলল, মুখীর জন্যে মন খারাপ হল?

আমি বললাম, না। আমার আবার মন খারাপ। আমার কারও জন্যেই মন খারাপ হয় না।

সেন হাসল। এই প্রথম ও আমার সামনে বহুদিন পরে।

আমি পাশ থেকে ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম হাসলে ওকে আরও ছেলেমানুষ দেখায়।

ও বলল, আজ হয় না, একদিন হয়তো হবে। কে বলতে পারে?

তারপরই বলল, মুখীকে আমরা কালই এসে নিয়ে যাব। মুখীর বরকেও। ও নইলে তোমার দেখাশুনা করবে কে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কোথায়?

তোমার বাড়িতে। তোমার নিজের ঘরে—তোমার চিরদিনের ঘরে।

আমি ভর্ৎসনার গলায় বললাম, কী ছেলেমানুষি করছ তুমি! ও সবের মানে বোঝো? আমার জন্যে তোমার এত সব ঝড়-ঝাপটা সইবার দরকার কি? আমি এমনি করেই বেঁচে থাকব—আমার জীবন অভিশপ্ত হয়ে গেছে। আমাকে চলে যেতে দাও। এমন ছেলেমানুষি কোরো না। তাছাড়া তোমার

সঙ্গে তো আমি কখনও ভালো ব্যবহার করিনি—তুমি আমার সম্বন্ধে এত নিঃসন্দেহ কী করে হলে? আমি তোমাকে পছন্দ করি যে, তুমি তা জানলে কী করে?

সেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, এখনও জানিনি। তবে একদিন যে করবে, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমাকে সুযোগ দাও তুমি। তোমাকে আমি প্রথম দিন থেকে ভালোবাসি। আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না, কিন্তু আমি প্রমাণ করব আমার ব্যবহারে যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তাছাড়া তোমাকে যখন এমন করে ভালোবেসেই ফেলেছি—তখন আমার চোখের সামনে তোমাকে নষ্ট হতে দিতে পারি না। তুমি যদি আমাকে ছাড়া, আমাকে ঘৃণাভরে চড় মেরেও সুখী হতে, সুখে থাকতে সবদিক দিয়ে, তাহলে আমার দুঃখ আমি একাই বয়ে বেড়াতাম। তোমার ওপর কোনোরকম দাবি করতাম না। কিন্তু এখন এ শুধু দাবি নয়, এ আমার কর্তব্যতে দাঁড়িয়েছে।

আমি বললাম, আমার প্রতি তোমার কোনো কর্তব্য নেই। তোমার অনেক দায়িত্ব আছে, তুমি ছেলেমানুষ, তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, তুমি কেন আমার জন্যে নিজেকে নষ্ট করবে? নিজের জীবন নষ্ট করবে?

নষ্ট নয়। নষ্ট নয়। আমি নিজেকে সার্থক করব। তুমি দেখো। সেন বলল। তুমি দেখো নিরুপমা।

দেখতে দেখতে আমরা ওর বাড়ির সামনে এসে পৌঁছলাম।

বেল টিপতেই বেয়ারা এসে আমার স্যুটকেস ভিতরে নিয়ে গেল।

সেন আমার হাত ধরে আমাকে ভিতরে নিয়ে এল। ঢুকে বলল পছন্দ তো? এই-ই তোমার বসবার ঘর। তারপর খাবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর, গেস্ট রুম, সব দেখিয়ে আমাকে বেডরুমে নিয়ে এল।

বলল, এই তোমার বেডরুম। আর বাথরুমটা পছন্দ?

বলেই বিরাট ঝক্‌ঝকে মোজাইক্ করা গিজার-লাগানো বাথটাব বসানো বাথরুম দেখাল। বেডরুমের এয়ারকন্ডিশনার চালানোই ছিল। সেটাকে বন্ধ করে দিল ও। তারপর হঠাৎ সেন দরজাটা বন্ধ করে আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। বলল, বড় কষ্ট পেয়েছ না নীরু, পৃথিবীর হাতে তুমি বড় কষ্ট পেয়েছ, না?

তারপরই আমার গালে ওর হাত বুলোতে বুলোতে বলল, সেদিন তোমার গালে কি খুব লেগেছিল? ঈশ্-শ্ বেচারি! তোমাকে চড় মেরে আমি নিজে যে কত কষ্ট পেয়েছিলাম তা যদি তুমি কখনও জানতে! তুমি যে সেদিন আমাকেও বড় কষ্ট দিয়েছিলে।

দরজায় কে যেন টোকা দিল।

দরজা খুলে বেয়ারাকে সেন বলল, পেছনের বারান্দায় লনের পাশে চা দিতে।

বেয়ারা চা দিতে এসেছিল।

বেডরুমের জানালা দিয়ে বারান্দাটা দেখা যাচ্ছিল। চওড়া সাদা টাইলের বারান্দা—সাদারঙ রট্-আয়রনের চেয়ার-টেবল্। লনে অনেক রকম ফুল করেছে মালি। আমি আনমনে বাগানের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

ভাবছিলাম, আমার মধ্যেও যেমন কতরকম ফুল ফুটছে এক এক করে। আমি সেই সুগন্ধি ফুলেদের ফোটা ভীষণভাবে উপলব্ধি করছিলাম। আমার কিছুতেই কিছু বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমার চারপাশের সব কিছু, সব ঘটনা অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছিল।

আমার বড় ভয় করছিল।

সেন আমার ঘোর ভাঙিয়ে বলল, আমি জানি, আমি দেখতে ভালো নয়, হয়তো কোনোদিক দিয়েই আমি তোমার যোগ্য নই, কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমাকে চাওয়ার মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই,

কোনো চালাকি নেই। আমি আর যাই-ই হই. আমি ভণ্ড নই নিরুপমা। তুমি যা দেখছ, যা শুনছ সবই সত্যি! তারপর একটু থেমে বলল, এই সবে শুরু। তুমি আমার সঙ্গে থাকলে, আমার পাশে থাকলে আমি জীবনে অনেক বড় হব; সার্থক হব। সেদিনও আমি ভুলে যাব না যে, তুমি আমার পাশে ছিলে বলেই আমি বড় হয়েছি! আমি তোমার ওপর অনেক ব্যাপারে, জীবনের সমস্ত রকমক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করব। তুমিও সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে পারো আমার ওপর বাইরের ব্যাপারে। যা কষ্ট পেয়েছ; পেয়েছ। আজ থেকে তোমাকে আমি সব রকম কষ্ট থেকে আড়াল করে রাখব। তুমি দেখো। দেখো তুমি নিরুপমা। আমার সোনা।

আমি যেন অসুস্থ, যেন দুর্বল, যেন নিজের পায়ে আমার ভর নেই নিজের, এমনি করে আমার বাহু ধরে বারান্দার দিকে আমাকে নিয়ে যেতে যেতে সেন আস্তে আস্তে বলল, আমি চাই, আমার কাছে দু'দিন থাকার পর তুমি কলকাতায় তোমার বাবার কাছে যাও। আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব। ওখানে গিয়ে তুমি ঠান্ডামাথায় সব ভেবে দেখো। তোমার দিক দিয়ে তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত—এখনও এবং ভবিষ্যতেও। যতখানি সময় চাও, আমি দেব; কিন্তু সময় নিও। তোমার দিক দিয়ে তাড়া করার প্রয়োজন নেই কোনো। যা করবে, ভেবে কোরো।

তারপর বলল, আমার কথা বলতে পারি যে, আমার দিক দিয়ে ভাবাভাবি সব শেষ।

আমি মনে মনে বললাম, এক্ষুনি আমি বাবার কাছে যাব না।

কিন্তু মুখে কিছুই বললাম না। আমি জানি, বাবার কাছে পরাজিত হয়ে না যেতে পারলেই আমি সুখী হই।

সেন মাঝরাস্তা থেকে আবার বেডরুমে ফিরে এল। ফিরে গিয়ে দেওয়ালজোড়া ওয়াড্রোবটা খুলল।

বলল, তোমার দিকটা খালি আছে। তোমার মনস্থির হলে তোমার জিনিস দিয়ে এটা ভরে দেব। তোমার পুরোনো জীবনের কোনো জিনিস এখানে এনো না। আমি নতুন-তোমাকে সব নতুন নতুন জিনিস ভরে দেব। আর দ্যাখো। এই ওয়াড্রোবে কাউকে লুকিয়ে রেখো না কিন্তু; কোনো বিড়ালকেও না।

আমার ভীষণ লজ্জা হল। আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করতে যাচ্ছিলাম।

সেন আমার মুখে হাত চাপা দিল। বলল, না। পুরনো কথাও ভুলে যেতে হবে। আমি কিন্তু ভুলে গেছি। আমি কিছু মনে করিনি, মনে রাখিনি—আমি যে তোমাকে ভালোবেসেছি নিরুপমা। আমার ভালোবাসার প্রকাশটা হয়তো বড় বুনো, বড় জংলি কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালোবাসি, এতে কোনো ফাঁকি নেই।

এই অবধি বলে, সেন আমার দিকে এক অদ্ভুত আদুরে চোখে চেয়ে রইল।

যে ছেলেটিকে, যে নাবালক ছেলেটিকে একদিন চড় মেরেছিলাম আমি, তার দিকে তাকাতে আজ আমার ভীষণ লজ্জা করতে লাগল। ও যেন সবদিক দিয়ে এ কয়েকমাসে আমার চেয়ে কত বড় হয়ে গেছে। ও যেন আমার নমস্য হয়ে গেছে; আমার সম্মানের যোগ্য হয়ে গেছে। আমি ভাবতে পারছিলাম না কী করে এমন হল; এত তাড়াতাড়ি কী করে হল। এত তাড়াতাড়ি সব কিছু কী করে বদলে যায়?

সেন আমার দিকে ওর দু'হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওর চোখে এক আশ্চর্য দৃষ্টি ছিল।

আমি স্বেচ্ছায়, ধীরে পায়ে, সুস্থমস্তিষ্কে, এক শান্ত কুয়াশাহীন আনন্দে ভেসে হেঁটে গিয়ে ওর বুকে নিজেকে সমর্পণ করলাম।

জানি না। আমি কি আবারও ভুল করলাম? নিজের মনে আমি নিজেকে বললাম, তুমি কি আর একটিও ভুল সইতে পারবে? আর একটি ভুলও? নিরুপমা?

কী করে ও আমার মনের ভাবনা জানতে পেল জানি না। সেন আমার সিঁথিতে ঠোঁট ঘষতে ঘষতে বলল, নিরুপমা, তুমি ভুল করোনি। দেখো, তুমি দেখো, এবারে ভুল করোনি।

আমি চুপ করে থাকলাম; আমি জানি না। একমাত্র কালই বলতে পারবে, ভবিষ্যৎই বলতে পারবে; আমি ভুল করলাম না ঠিক করলাম।

সেনের বুকের আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই আমার মনে হল, এই ঠিক ভেবে ভুল করা এবং ভুল ভেবে ঠিক করা, এই সব ভুলের দুঃখ, সব ঠিক করার আনন্দ, এই টুকরো টুকরো সুখ ও দুঃখ নিয়েই তো আমাদের জীবন। মনে হল, কারও জীবনেই, কেউই কাউকে সুখের গ্যারান্টি দিতে পারে না। জীবনে বেঁচে থাকতে হলে প্রতিনিয়ত দুঃখ হয়তো পেতেই হয়—তবুও এই অনেক দুঃখের মধ্যে যেটুকু সুখ যে ছিনিয়ে নিতে পারে, সেই-ই সুখী; সেই-ই তা পেল। যে ছিনিয়ে নিতে পারল না; পেল না। এর কোনো বিকল্প নেই।